সুভদ্রা অনন্যা

ড. দীপক চন্দ্র

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

দ্বিতীয় প্রকাশ :
এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার মান্না
পারুল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরম পূজনীয়া

মাসিমা'কে

শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ

শ্রীচরণেষু

সবতীর্থের সেরা তীর্থ প্রভাস। সুভদ্রা ও কৃষ্ণর খুবই প্রিয় জায়গা। বৎসরান্তে মকর সংক্রান্তিতে একবার এখানে তারা আসবেই। এবারও এসেছিল।

প্রভাসের সঙ্গে সুভদ্রার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সমুদ্রের ধারে বসলেই নতুন জীবন পায়। চোখের সামনে দিগন্তনীল যে নীল সমুদ্র তার কোনো হারানোর ভয় নেই। কেশর ফোলা সিংহের মতো গর্জন করতে করতে বিশাল বিশাল ঢেউগুলোকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওটাই তার খেলা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একই নিয়মে খেলা করছে। অথচ কোনো একঘেয়েমিতা নেই। প্রতিটি মুহূর্ত দাগ রেখে দিয়ে যায় সুভদ্রার বুকে।

কৃষ্ণ ওর ভালো লাগাটা বোঝে। ঈশ্বর তাকে ভাবনার ক্ষমতা দিয়েছিল। দিয়েছিল, অনাবিল চোখকে খোলা হাওয়ায়, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে সবকিছুকে অনুভব করা কিংবা ভালোবাসার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তাই প্রকৃতির মধ্যিখানে বসে কৃষ্ণ তাকে প্রকৃতির রূপ, রঙ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শকে গভীর করে অনুভব করতে শিখিয়েছিল। কৃষ্ণ তাকে ফুল চেনায়, পাখি চেনায়, প্রজাপতি দেখায়। ছোট গাছের ডালে বসে দোল দেয়। কাঠবিড়ালী ধরার খেলায় পিছু পিছু তার সঙ্গে ধাওয়া করে এক মজার খেলায় মাততো। আচমকা সিংহের ডাকে ভয় পেয়ে কৃষ্ণের বুকে মুখ লুকোত। ভয়ের ঘোর কেটে গেলে বলত, ভারি সুন্দর জায়গা। এর আলো-ছায়া, মেঘ-রোদ্দুর, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ, বনের গন্ধ, আকাশের নীল, সমুদ্রের নীলিমা, টিয়ার সবুজ, বনের সবুজিমা, শঙ্খচিলের ডাক সব কী সুন্দর। এসব তুমিই আমাকে চেনালে। তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। এসব ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। অথচ সবই কী ভীষণ নির্লিপ্ত। হৃদয় দিয়ে শুধু বুঝে নিলে হলো।

মুগ্ধ হয়ে শুনল কৃষ্ণ। মরা রোদের কমলা রঙের আলো গায়ে মেখে ভাই ভগিনী বালুকাময় তীরের রেখা ধরে হাঁটছিল। সত্যভামা আসছিল ওদের পিছন পিছন। সমুদ্রপাড়ের সবুজে ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সাগরের মাঝ বরাবর নীল জলরাশির দিকে চোখ দুটি ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল সুভদ্রা। মাথার ওপর নীল আকাশ, সাদা মেঘ ছোঁয়া সবুজ পাহাড়, পাহাড়ের নীচে নীল সমুদ্রের জল, দিগন্তের গায়ে লেগে থাকা ছোট-বড় কুঁড়েঘর কেমন নেশা ধরিয়ে দিল।

হু-হু করে উন্মাদ বাতাস ছুটে এসে চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। সেই সঙ্গে তার আঁচল উড়ছিল বাতাসে পত্ পত্ করে। সুভদ্রা ভ্রূক্ষেপ করল না। এক আশ্চর্য ভালো লাগার অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

একটু দুরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ ভগিনীকে দেখছিল। সূর্য অস্ত গেছে।

নরম চাঁদের আলোয় থই থই করছিল সমুদ্র সৈকত। আত্মমুগ্ধ সুভদ্রাকে এই সুন্দর পটভূমিতে ভীষণ ভালো লাগছিল। নির্জনতাই যেন সুভদ্রাকে বেশি করে মূর্ত করে তুলল। অন্তর্মুখী হওয়ার জন্যই সকলের থেকে আলাদা সে। সকলের মধ্যে থেকেও কারো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। আবার বিচ্ছিন্নও নয়। সে আছে ব্যাপ্ত হয়ে।

সত্যভামা নিঃশব্দে সুভদ্রার পাশে চুপটি করে বসেছিল। কৃষ্ণের ওপর চোখ পড়তে মোহন হাসি ফুটল তার অধরে। সত্যভামা যে কিছু বলার ভূমিকা করছিল তার স্মিত হাসি দেখেই সুভদ্রা বুঝল। বলল, কিছু বলবে? মনে হচ্ছে, আমায় নিয়ে তোমার যত কৌতূহল। তাই না?

সত্যভামা বলল, তোমাকে দেখলে মনে হয় খুব একা তুমি। মুখে কিছু না বললেও আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার বুকে কষ্টের মতো ব্যথা বাজে এক ধরনের।

সুভদ্রা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, নিজের মতো ভাবার একটা সুখ আছে। এই সমুদ্রের ধারে বসে থাকলে কত কী মনে হয়। সমুদ্রের কাছেই নদীর আগামীকালের সব ভরসা ও প্রত্যাশা। কেন যে এসব কথা মনে হয়?

সত্যভামা ওর পিঠে হাত রেখে বলল, এমন উদ্ভট কথা হঠাৎ তোমার মনে হল কেন?

সুভদ্রা বেশ একটু অবাক হয়ে বলল, উদ্ভট বলছ কেন? নির্জনতার বুকে কান রাখলে তুমিও শুনতে পাবে নদীর কথা। নদী মানুষের মতো কথা বলে না, বুঝে নিতে হয়। নদী হলো নারীর মতো। অনন্ত যাত্রার পরে সাগরে মিশে যায়। এমন কি তার নামটাও মিলিয়ে যায় সমুদ্রের গভীরে। তার সব পরিচয় তখন সমুদ্রকে নিয়ে। একজন নারীর জীবনও তাই। সংসারে পুরুষকে সর্বস্ব সমর্পণ করে। তার নিজের বংশ, ধর্ম, গোত্রর কিছুই থাকে না। সবই পুরুষের পরিচয়েই পরিচয় তার। ঠিক বললাম তো? সমুদ্রের মতো পুরুষরাও চায় বিস্তার। তার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য। সমুদ্রের যেমন নদীর দিকে ফিরে তাকানোর সময় নেই, পুরুষেরও নারীর মনের কষ্টের দিকে তাকানোর সময় নেই। সমুদ্রের মতো পুরুষরা স্বার্থপর শুধু নিজেকে নিয়ে মগ্ন। অথচ সব নদী নারীর মতো কত প্রত্যাশা নিয়ে সমুদ্রে পৌঁছয়। তারপর আর কোনো গন্তব্য থাকে না। তার নিজস্বতা বলতে যা কিছু ছিল তা সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। যার লাগি নদীর এত প্রতীক্ষা সাগর সঙ্গমে পৌঁছে সে নিজের সম্পর্কে কিছু জানতে চায় না। হিসাবও করে না কী হারাল? পরিপূর্ণতা

তাকে এক নতুন জীবন দেয়। বিয়ের পরে সব মেয়ের যেমন হয়। তার সব পরিচয় তখন সাগরে হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো হয়। বিয়ের পিঁড়িতে পুরুষকে বরণ করে নেওয়ার পরে সব নারীই নদীর মতো হয়ে যায়। নারী ও নদী, পুরুষ ও সমুদ্র যেন অভিন্ন।

সত্যভামার মুগ্ধ দুটি চোখ সুভদ্রার চোখের উপর স্থির হয়ে রইল। সকৌতুকে সুভদ্রার দুটি চোখে বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। বলল, ভুল বললাম কি? তাহলে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

সত্যভামা অভিভূত আচ্ছন্ন ভাবটা পাছে নষ্ট হয়ে যায়, তাই কথা বলল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ পরে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল বুকের অভ্যন্তর থেকে। সত্যভামার দু'চোখে দুষ্টু হাসি, অধরে কৌতুক। বলল, নদীর চলমান স্রোতে কান পেতে থাকলে অনেক কিছু মনে হয়। এমন কি নিজের মনের অভ্যন্তরের কথাও শোনা যায়। সাগর বেলায় বসে তুমি অন্য এক জীবনের স্বপ্নে বিভোর। তাই সাগর, নদী—জীবন সব একাকার হয়ে গেছে তোমার চেতনায়। নিজেকে আবিষ্কার করার এই নেশাই তোমাকে অন্য এক অনুভূতি দিল। বিয়ে না করেই নারী ও পুরুষের জীবন রহস্য ভেদ করেছ। বুঝতে পারছি তোমার বুকে সঙ্গমের তৃষ্ণা। এবার দাদাদের বলতে হবে 'বোনের পাত্র দেখতে।'

সহসা এক গভীর সুকোমল লজ্জায় সিক্ত হলো কণ্ঠস্বর। এক লাজুক অপ্রতিভতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল, ভাবী! ভালো হবে না বলছি। তুমি যেন কী।

সত্যভামার অধরে মোহন হাসি। প্রশ্রয়ে সুন্দর। চোখের চাহনিতে অনির্বচনীয় কৌতুক। বলল, সব কথা কী বলে বোঝাতে হয়? আমারও একদিন তোমার বয়স ছিল। এর মধ্যে ভুলে যেতে পারি? সত্য যা এমনিভাবে হঠাৎই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এর নাম জীবন।

সুভদ্রা অনুযোগ করে বলল, এভাবে আমাকে লজ্জায় ফেলে তুমি কি খুব মজা পাও?

সত্যভামার অধরে সেই অনির্বচনীয় হাসি। বলল, তা একটু পাই বৈকি।

কৃষ্ণ প্রভাস ছেড়ে যাওয়ার বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা। বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে অর্জুন অবশেষে প্রভাসে পৌঁছল। প্রভাস তীর্থ হল সব তীর্থের সেরা তীর্থ। এই মাটিতে মোক্ষ লাভ হয়। তাই কি এখানে পৌঁছে মনটা তার অন্যরকম হয়ে গেল? একেই কী স্থানমাহাত্ম্য বলে? প্রশ্নটা অর্জুন নিজেকে নিজে করল। অন্যান্য তীর্থ দর্শনের সময় এমন নির্মল আনন্দ ও মুক্তি কখনও আগে বোধ করেনি। নির্মল

আনন্দে তার সমস্ত অন্তঃকরণ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে গান গেয়ে ওঠল—

মোর মন্দির অবলো নেহি আয়ে
কওনসী ভুল ভঁয়ি মেয়োঁ আলি
প্রেম পিয়া বিনা আঁখিয়া তরস রহি
উনবিনে জিয়া ভরসায়ে।

গানের ভাব, ভাষা, সুর সব প্রাণ থেকে ওঠে, সুরে ভরপুর হয়ে এক আকুতি সৃষ্টি করল। সমুদ্রের জল ভাঙার শব্দের সঙ্গে বাতাসের শব্দ মিলে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হল।

প্রভাসের নিরালা সাগরবেলায় বসুদেব নন্দন গদ একাকী ভ্রমণ করতে করতে থমকে দাঁড়াল। এক অপার্থিব গানের আকর্ষণে সে গায়ককে খুঁজে বার করল। সমুদ্র পাড়ের প্রাচীন বটগাছের নীচে এক ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে গানে বিভোর হয়ে থাকতে দেখল।

গলাটা গদের খুব চেনা বোধ হল। দীর্ঘকাল পরে হলেও চেনা গানের সুরে ও কথায় গদের চিত্ত আলোড়িত হল। বহুদিন আগে ইন্দ্রপ্রস্থে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের গলায় এই গান শুনেছিল। কথাগুলো তার মনে নেই। কিন্তু সুরটা কানে অনুরণিত হয়। কণ্ঠস্বরটা অর্জুনের মতোই বোধ হল। গানের ঐ মায়াবী সুর এখনও কানে লেগে আছে তার। অর্জুনের সুরসিক্ত গলায় এমন এক আকুতি ছিল যে, সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে ভেসে তা যেন বৈকুণ্ঠের দিকে গেছে। শ্রোতাদের সঙ্গে সেই সুরের এবং ভাষায় এমন একটা নিবিড় যোগাযোগ হয়ে গেছিল যে আজও তার দৃশ্যটি গদ ভোলেনি। ঐ গানে তৃতীয় পাণ্ডবের শান্ত সমাহিত সেই ভাবটি আজও গদের চোখের তারায় ভাসে। ইন্দ্রপ্রস্থের জলসাঘরে রাজকীয় পরিবেশে গণ্যমান্য রাজপুরুষ এবং আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের সামনে বসে অর্জুন আস্তে আস্তে সুরের কাঠামোর ওপর একটি একটি করে গানের কথা বসাচ্ছিল বড় যত্নে এবং ভক্তিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মনিবেদনের মাধুর্যে হৃদয় মনকে এমন আকুল করেছিল যে শ্রোতারা কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। এই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর গাওয়ার ধরণটিও তেমন। তাহলে এই সন্ন্যাসী কী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। গদের মনে হল, ঐ সুরেই সঠিক মানুষটিকে সে চিনেছে। তার চেনায় কোনো ভুল নেই।

গান শেষ হলে সন্ন্যাসীকে গদ বলল, বড় সুন্দর গান গাও ভাই। ভারি ভালো লাগল। বহুকাল আগে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কণ্ঠে এমন গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সন্ন্যাসী গদের দিকে চেয়ে রইল। তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করল। কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং বলরামের সহোদরকে চিনতে ছদ্মবেশী অর্জুনের ভুল হল না। পাছে ছদ্মবেশ ধরা পড়ে তাই সন্ন্যাসীবেশী অর্জুন গদকে না চেনার ভান করল। বলল, গান তো গায়কের একার জিনিস নয়। গান হল শ্রোতারও।

গদ জিগ্যেস করল, আপনার গুরু কে?

প্রকৃতি। প্রকৃতির রূপ রঙ আমার গানের ভাষা, শব্দ হল সুর। গন্ধ হল মন মাতানো আবেগ সুরের মায়াজাল হয়ে চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

গদ সন্ন্যাসীর দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে বলল, ইচ্ছে করলেই কী কেউ সন্ন্যাস নিতে পারে? শুধু গেরুয়া বসন পরলেই কী সন্ন্যাসী হওয়া যায়?

সন্ন্যাসী বলল, জানি না। তবে বসনের রঙ মনেতে তো লাগে।

সন্ন্যাসীর স্মিত হাসিটি ভারি মিষ্টি। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়।

গদ বলল, তৃতীয় পাণ্ডব তোমার সমবয়সী হবে। তারও গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। তোমার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের অন্তরালে আমি তাকেই দেখছি। সে কি ভুল?

সন্ন্যাসী ওর তীব্র তীক্ষ্ণ সন্দেহের ওপর চোখ রেখে বলল, তোমার কথায় অবিশ্বাস, চোখে সন্দেহ। তুমি যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

আমি গদ। বলরামের মধ্যম ভ্রাতা। কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাকে কখনও দেখেছো মনে হয়?

এ জীবনে কত মানুষকে কত জায়গায় দেখেছি। তাদের সবাইকে মনে রাখা সম্ভব?

গদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার অগ্রজ বসুদেব নন্দন কৃষ্ণকে চেন?

সন্ন্যাসীর ইচ্ছে করল, গদকে মিথ্যে বলে। কিন্তু সখা কৃষ্ণকে অস্বীকার করলে মিথ্যাচারণ করা হয়। তাই চুপ করে রইল।

সন্ন্যাসী নিরুত্তর রইল। গদ পুনরায় জিগ্যেস করল, আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না কিন্তু।

সন্ন্যাসী বুঝতে পারল গদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। পাছে পরিচয় উদ্ঘাটন হয়ে যায় তাই অন্য কথা বলল, সন্ন্যাসীদের অতীত বলে কিছু নেই। পূর্ব জীবনের কোনো কথাই স্মরণ করতে নেই।

গদ হেসে বলল, আমার সন্দেহ ঘুচেছে। নিজেকে লুকোতে চাইলে কি লুকনো যায়? তুমি হলে আমার পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। তোমাকে চিনতে ভুল হয় না। তোমার গায়ের ঐ কালো রঙ, নীল চোখ, নারী সুলভ সুঠাম কোমল পেলব শরীর শিল্পীর ছেনি বাটুলি দিয়ে গড়া কালো পাথরের মূর্তির মতো।

একবার যে দেখবে তার চোখে গাঁথা হয়ে যাবে। আর আমি তো কয়েকবার দেখেছি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে প্রথম দেখি। তখন উনত্রিশ বছরের যুবা তুমি। আমি ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর। তারপর ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় তোমাকে অন্দরমহল থেকে দেখেছি। আবার আজ দেখা হল নতুন করে নতুন বেশে। কিন্তু তুমি আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারোনি।

গদ অর্জুনের পাশে বসল। শশব্যস্ত হয়ে সন্ন্যাসী বলল, কর কী? এমন করে ধুলো-বালির মধ্যে বসে কেউ? সন্ন্যাসী ও গৃহীর মানসিক পার্থক্য তো একটা আছেই। আমি চাই না তোমার চিত্ত আলোড়িত করতে। তাছাড়া উচ্চমার্গের সন্ন্যাসী আমি নই। অলৌকিক কোনো শক্তিও নেই আমার। তোমার কোনো কৌতূহলে লাগব না ভাই।

গদ হাসল। বলল, নিজেকে লুকোতে চাইলে কি লুকোনো যায়? তুমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছ বন্ধু। অস্বীকার করে লাভ নেই। আমাকে তোমার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। আমরা আত্মীয়, পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু এমন অদ্ভুত ছদ্মবেশে ঘুরছ কেন? ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের এই ছদ্মবেশ কেন তোমার? জনহীন এই সাগরকূলে কার সন্ধানে এসেছ? এখানে কার সাধনা তুমি করবে? সাধনা না থাকলে এমন অনির্বচনীয় অপার্থিব গান গাইতে পারতে না। ঈশ্বরবোধ যার নেই অপার্থিব গানে তার এত দরদ থাকত না। মনে হল, এ গান তুমি গাইছ না, কেউ তোমাকে দিয়ে গাইয়ে নিচ্ছে।

গদের স্তুতির ভিতরে রোমহর্ষ, রহস্যময় আনন্দের যে অনুভূতি ছিল তা অর্জুনকে আপ্লুত করল। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। বৃথা আত্মগোপনের চেষ্টা থেকে বিরত হল অর্জুন। বলল, প্রভাস দেখার বড় সাধ ছিল মনে। নদী পাহাড় ঘেরা এই সমুদ্রবেলায় সাধু-সন্তের ভিড়। বহু দেশ ঘুরে মনে হল এখনও অনেক কিছু জানা হয়নি, দেখা হয়নি। কিসের নেশায় সন্ন্যাসীরা ঘর ছাড়ে, মায়া মোহের বন্ধন ছিন্ন করে, আরাম বিলাস, সুখ ত্যাগ করে ক্লেশকে সানন্দে গ্রহণ করে—এসব জানতে খুব ইচ্ছে ছিল।

গদ বলল, তুমি কিন্তু সত্যি কথা বললে না।

বিশ্বাস কর, নরনারীর প্রেম, সন্তানের মায়া, মায়ের মমতা ত্যাগ করার জন্য মনের যে জোর চাই, সে কি আমার আছে? মোহমুক্ত হওয়ার জন্য কত কী করলাম, তবু মন মোহমুক্ত হল কোথায়? তাই জনপদ ছেড়ে এবার নির্জন বনভূমি, নিরালা পাহাড়, পরিত্যক্ত তীর্থক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে নিজের মনকে আবিষ্কার করছি। নানা দেশ, নানা জায়গা ঘুরে এবার প্রভাসে এসেছি। আত্মদর্শন ও বন্ধুদর্শনের

লোভেই এসেছি। মনে হচ্ছে, মোহমুক্ত হওয়ার সেই মনটাই বোধ হয় আমার নেই। মহৎ বোধে মনের অভ্যন্তরের কামনা, বাসনা, লোভকে অতিক্রম করে সব সত্যের চরম এবং পরম যিনি চিরকালীন, যিনি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে পথ দেখান, সত্যকে চেনান সেই বোধে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এবার তাঁকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করব বলে ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশ ধরেছি।

গদ বলল, প্রভাসের তীরে দাঁড়িয়ে তোমার কথাগুলো শুনতে ভীষণ ভালো লাগছে। মন চুপ করে থাকলে মস্তিষ্কের মধ্যে কথাগুলো কী নীরব থাকে? অন্যে শুনতে পায় না ঠিকই, কিন্তু তুমি তো শুনতে পাও? তাহলে মন যা চায় তাই করলে, মনের সঙ্গে কামনা বাসনার কোনো বিরোধ থাকে না। জোর করে কিছু করতে চাইলে নিজের সঙ্গে নিজের শঠতা করা হয়। তোমার আসল আমিটা কিন্তু প্রভাসে বন্ধু দর্শনে ব্যাকুল।

অর্জুন থমথমে গলায় বলল, কৃষ্ণ প্রভাসে আছেন শুনেছি। আমার আগমনের বার্তা তাঁর কাছে ঠিক পৌঁছবে। যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ এখানেই কুটীর নির্মাণ করে বাস করব।

তোমার মতলবটা কী বলো তো?

আমি একজন ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। আমার কাজ হল বন্ধন মুক্তি ও আনন্দ সম্পর্কিত বোধকে ভক্তজনের হৃদয়ে গেঁথে দিয়ে পরমার্থ তৃষ্ণায় আকুল করা। কিন্তু এই কাজটা পরিপূর্ণভাবে নিংড়ে দিতে পারলেই তারা জড়ো হবে আমার চারপাশে। তখন মুখে মুখে রটে যাবে আমার আগমন বার্তা। গানের বাণী এমন এক অনির্বচনীয়তা সঞ্চার করে যে, মনকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করে দেয় বিশ্বনিখিলে। জ্যা মুক্ত তীরের মতন মনকে ঠিকই বিদ্ধ করবে। মুক্তির খিদে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে ভক্ত আসে মনের তৃপ্তি ও আনন্দ পেতে। আর সেই আনন্দই তাকে মুক্তির জন্য আকুল করে। এই পরিতৃপ্তির সূত্রে সন্ন্যাসীর আগমন বার্তা পৌঁছে যায় পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

অর্জুনের চোখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল গদ। বলল, তুমি পারোও বটে। সন্ন্যাসী সাজলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়? সন্ন্যাসী হওয়ার মনটা নেই তোমার। তাহলে নিজের সঙ্গে ভণ্ডামি করছ কেন?

সন্ন্যাসীর কাজের পিছনে উদ্দেশ্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা। মুক্তির খিদে নিয়ে ভক্ত আসে। সন্ন্যাসী কী পেল তার হিসাব করে না। ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। অকারণে মনকে আবিল করলে অন্যকে বৈরাগ্য শেখাব কী করে? নিজেও বা ঈশ্বর চিন্তা করব কী করে?

তোমার কথাগুলো পরস্পর বিরোধী। তুমি যে কী চাইছ নিজেও জানো না। কৃষ্ণের কাছে শুনেছি ব্রহ্মচর্য পালন করতেই স্বেচ্ছায় বনবাসী হয়েছিলে। কিন্তু ব্রহ্মচারী ছিল তোমার ছদ্মবেশ। তাই নারীসঙ্গ করতে দ্বিধা করোনি। নারীসঙ্গ তৃষ্ণায় তুমি তৃষ্ণাতুর ছিলে। একাধিক নারী তুমি চেয়েছ এবং পেয়েছ। নিজেকে পুণ্য ও ধন্য করেও কোথাও বাধা পড়োনি। আবার থেমেও যাওনি। পথিকের মতো চলাকেই তোমার গৌরবের মনে হয়েছে। এই আসক্তিতে বন্দী তোমার আমিত্ব। এই আমিত্বের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখ। তবেই আত্মদর্শন হবে।

অর্জুন চমকাল। অভিমানাহত হয়ে বলল, তোমার যা খুশি বলতে পার। কিন্তু আমার মনে অন্য রঙ। অন্য এক ব্যাকুলতা। তুমি বুঝবে না।

গদ সকৌতুকে বলল, রম্ভা, উর্বশীরা এখানে চুপি চুপি আসে। জল ছিটিয়ে স্নান করে। পা দাপিয়ে সাঁতার কাটে। তুমি কী তাদের প্রতীক্ষায় থাকবে।

অর্জুন হাসল। বলল, মজা করছ। এখানে আসা অবধি আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন জেগেছে। অহরহ প্রশ্ন করছি নিজেকে। এ আমার কীসের চাঞ্চল্য? কার জন্য অস্থিরতা? আমার মন কাকে খুঁজছে? কেন খুঁজছে তাকে? যতক্ষণ না আমার চিত্ত প্রশান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ এখানে বসেই নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজব।

গদের অধরে বিচিত্র হাসি। বলল, লোকে তোমাকে ললনা প্রিয় বলে। রমণীর গায়ের ঘ্রাণ চিনতে তোমার ভুল হয় না। নারীর দেহ সৌরভের গন্ধে আকুল তোমার অন্তঃকরণ। তাই তোমার চিত্ত এত অশান্ত, এত অস্থির। সত্যি কথা বলো তো, এখানে কেন এসেছ? নিশ্চয়ই কোনো রমণীকে খুঁজছ? সে কে? কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা কি সে? কয়েকদিন আগেও সে এখানে ছিল। তুমি ভাই দেরি করে ফেলেছ।

গদ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। দুষ্টু দুষ্টু চোখে তার দিকে তাকিয়ে মজা করে বলল, আমার বোন সুভদ্রা খুব মিষ্টি মেয়ে। ভীষণ নম্র এবং শান্ত। সন্ধ্যাদীপ শিখার মতো স্নিগ্ধ। রূপ তো নয় রূপের সমুদ্র। গায়ের রঙ পাকা ভুট্টার দানার মতো সোনালি শুভ্র, রেশমের মতো কোমল আর অমাবস্যার কৃষ্ণময় অন্ধকারের মতো তার কুঞ্চিত কেশদাম, বেলাভূমির মতো তার কপাল অচিন্ত্যনীয় কল্পনার সৌন্দর্যের রসদ। দুই চোখের তারায় তার এক আশ্চর্য সোনালি মায়া। স্বপ্নে দেখা পরীর মতো। নিজের ভগিনী বলে বলছি না, পাঞ্চালিও বোধ করি রূপে তার সমকক্ষ নয়। সুভদ্রার সামনে দাঁড়াতে সেও লজ্জা পাবে। পাঞ্চালীর শাণিত ব্যক্তিত্বের চোখ ধাঁধানো প্রখর ছটা সুভদ্রার নেই। সে হল জ্যোৎস্না রাতের রমণীয় চাঁদের মতো স্নিগ্ধ, কমনীয় এবং মনোরম।

অর্জুনের অধরে খুশির হাসি। বলল, ভগিনীর রূপের কথা বলতে এত উচ্ছ্বাস জাগে প্রাণে? সব ভাইয়ের চোখে প্রিয়তম ভগিনী সুন্দর। আমাদের ভগিনী নেই, তাই ওই বোধটুকুর অভাব এই মুহূর্তে পীড়িত করছে। তোমার প্রতি ঈর্ষা হচ্ছে। কৃষ্ণও তার কথা বলেনি কোনোদিন। তা না বলুক, তোমাদের এত প্রিয় রূপসী ভগিনীকে দেখার জন্য মনটা আমারও ব্যাকুল হয়েছে।

গদ বলল, তা হলে আমার সঙ্গে তোমাকে দ্বারকায় যেতে হবে।

যাব। নিশ্চয়ই যাব, তবে আজ নয়। এখানে আমার কিছু কাজ বাকি আছে। তাই কিছুদিন একা থাকতে হবে।

গদ জিগ্যেস করল, তোমার মতলবটা কী বলো তো?

সন্ন্যাসীর কাজের পিছনে কোনো মতলব খুঁজতে নেই। সন্ন্যাসীর প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা নেই। ভক্তের ভক্তি আর মনের তৃপ্তিই তার একমাত্র প্রত্যাশা। তুমি ভেব না সুভদ্রার রূপের প্রশংসা শুনে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। সব নারীর সঙ্গ এবং সান্নিধ্য আমার ভালো লাগে। নারী আমার মা, ভগিনী, প্রিয়া শুধু নয়, নারী আমার উৎসাহ, প্রেরণা, উদ্দীপনা। নারীর কাছে একটু বসলে শান্তি পাই, নারীর সান্নিধ্যে নতুন হয়ে ওঠি, নতুন করে প্রাণ পাই। ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নবীকৃত হয়। নারী হল আমার প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু। নারীর অপর নাম আমার কাছে জীবন। কথাগুলো তার অন্তরের ভালোলাগার গভীরে ডুব দিয়ে ডুবুরির মতো তুলে আনল।

অর্জুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল গদ। সেই সময় একটা ঈগল উড়ছিল ঘুরে ঘুরে নীল আকাশে। অনেক উপরে। সেদিকে চেয়ে গদ স্বগতোক্তি করল। বলল, আকাশে ওই ঈগলটা অত উঁচুতে শ্যেনদৃষ্টিতে যে কী খুঁজছে ওই জানে।

স্মিত হেসে অর্জুন বলল, ঠিক বুঝলাম না। কথাটার লক্ষ্য কী আমি?

গদ সবিস্ময়ে অর্জুনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল। তারপর বলল, তুমি উদ্দেশ্য হতে যাবে কেন? মনে এল, তাই না ভেবেই বললাম। জোর করে কেউ যদি নিজের সঙ্গে জড়িয়ে অন্য মানে খুঁজতে চেষ্টা করে তাহলে আমি নিরুপায়। তাছাড়া, তুমি বয়সে বড়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতেও বড়। তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ, রেষারেষিও নেই। অকারণে তোমায় বিদ্ধ করব কেন?

হঠাৎই অর্জুন বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তবু আমি বিদ্ধ হয়েছি। সব কথা তো সকলকে বলা যায় না।

গদ বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই প্রস্থান করল।

গদ চলে গেলে অর্জুন একেবারে একা হয়ে গেল। সামনে নদী, পিছনে সবুজ ঘেরা বনভূমি এবং পাহাড়ের শান্ত সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বসে প্রভাস দর্শন করা। স্বচ্ছ জল আর নিবিড় সবুজ, মাথার ওপর আকাশের নীল, তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘের দিকে চোখ জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে ভাবছিল একজন মানুষের মধ্যে কতজন মানুষের যে বাস মানুষ নিজেও জানে না। মনের উদ্যানে বসে শোভা দর্শনের মতো নিজের বুকের মধ্যে তার ফুল ফুটিয়ে তুললেই তবে তার ঘ্রাণ অনুভব করা যায়।

এই মুহূর্তে কৃষ্ণের কথা খুব করে মনে হচ্ছিল। অর্জুনের সব রকম অভিমান তো তারই ওপর। কৃষ্ণের জন্যই তার জীবনটা কার্যত তছনছ হয়ে গেল। অথচ, সেজন্য একটুও সহানুভূতি নেই তার। এমন কি তার সঙ্গে অনেককাল সম্পর্কও নেই। থাকবে কী করে? হয়তো ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে তার কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আর কেউ না বুঝলেও কৃষ্ণ তো জানে তার জন্যই দ্রৌপদীকে বধূ করে পাওয়া হল না এ জীবনে। বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীকে বীর্যবলে সে জয় করল, তারপর জননী কুন্তীর বেফাঁস কথায় দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের বধূ হয়ে গেল। অথচ, শেষ বিচারের ভার কুন্তী তাকেই দিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কুন্তীকে সমর্থন করল। দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাইয়ের ভার্যা করে তাকে বঞ্চিত করল। একজন নারীর বহুবল্লভ থাকার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে কুন্তীকেই জিতিয়ে দিল। তাকে নিরাশ করে কী সুখ হল, কৃষ্ণই জানে। কিন্তু তার সব দুর্ভাগ্যের হেতু কৃষ্ণ। এমন কি তার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হওয়ার মূলেও আছে কৃষ্ণ। এসব কারণে কৃষ্ণের ওপর অর্জুনের অপ্রকাশ্য রাগ ও অভিমান ছিল। হঠাৎই প্রভাসতীর্থে অর্জুনের অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল।

কতদিন হল, তবু কৃষ্ণ তার খোঁজ করেনি। জানতে চায়নি সে কী করছে, কেমন আছে? অথচ, এই সময়ের মধ্যে তার জীবনে কত কী ঘটে গেল। ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠিয়ে কৃষ্ণ কিন্তু একবারও জানতে চায়নি। সে কিংবা যুধিষ্ঠিরও তাকে কিছু জানায়নি। জানলে কী করত সে কৃষ্ণই জানে। কৃষ্ণের ওপর যত রাগই থাকুক অর্জুনের বিশ্বাস সে প্রভাসে এসেছে একথা জানলে কৃষ্ণ একবারটি তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। না এসে পারত না! কারণ, তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকি আছে।

অবশেষে অর্জুনের মান ভাঙতে কৃষ্ণ সুদূর দ্বারকা থেকে সটান প্রভাসের সমুদ্রতীরে পৌঁছল। অর্জুনের কুটীরের সামনে রথ থামল। অর্জুন! অর্জুন করে ডাকতে ডাকতে কুটীরে প্রবেশ করল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না তাকে। বড়ই

নিরাশ হল কৃষ্ণ। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রবেলায় কোথাও মানুষ নেই। কেবল একটি বাচ্চা ছেলে মহিষের পিঠে চড়ে, দিল উজাড় করে বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। তার কোনো সঙ্গী নেই। মনে হচ্ছিল নিজেকে পুনরাবিষ্কৃত করতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। ঐ বালকটির পাশে নিজেকে তার বড় দীন মনে হল। মনে মনে বলল, ঐ বালকের মতো সে হতে পারবে না। ভালোবাসার ডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। যে জীবনকে এতখানি ভালোবাসে, জীবন যাকে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রাখে তার কখনও পালানো হয়? বন্ধনই তার কপাল লিখন। ইচ্ছে করলেও জীবনের বজ্রমুষ্ঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে অর্জুনের মতো লুকোতে পারবে না। আবার বেরিয়ে পড়তেও পারবে না। জোর করে দৌড়ে যাওয়া সহজ কিন্তু ঘুড়ির লাটাইতে বাধা বলে সুতোর টানে আবার ফিরে আসে নিজের জায়গায়।

কৃষ্ণের মাথার উপর দিয়ে একটা বালি হাঁস উড়ে যেতে উদাস অন্যমনস্কভাবটা কেটে গেল। বহু দূরে কয়েকজন জেলে হাঁটু জলে নেমে জাল ফেলছিল। দূর থেকে তাদের ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অর্জুনের মতো কাউকে দেখতে পেল না। তবে কি, তার আগমন অনুমান করে পূর্বাহ্নেই গাত্রোত্থান করল। প্রশ্নটা কৃষ্ণ নিজেকে করল। অর্জুনের অনেক রাগ, অভিমান জমা হয়ে আছে তার ওপর। থাকারই কথা। বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীকে ভুজবলে জয় করেও তার ওপর একার আধিপত্য সে পেল না। দ্রৌপদী হতে পারত তার একার ভার্যার। কিন্তু লুটের মালের মতো কুন্তী পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তাকে বিলিবণ্টন করে দিল। কুন্তীর পক্ষ নিয়ে সে তার অনুমোদন করেছিল। এক স্ত্রীলোক বহু পুরুষের ভার্যা হয়েছে। শাস্ত্র থেকে তার বহু দৃষ্টান্তও তুলে ধরল। কৃষ্ণের এই বৈরী মনোভাবকে অর্জুন যদি ক্ষমা না করে তাহলে দোষ দেওয়া যায় না। তার জায়গায় থাকলে সে অমন বন্ধুর মুখ দর্শন করত না। তার সংস্রব থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকত। কিন্তু অর্জুন তা করেনি। যদিও তার মনে করার মতো কারণ ছিল যে, কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করতে কৃষ্ণ পারেনি বলেই, কৌশলে তাকে অর্জুনের কেন, পাণ্ডবদের কারো একার ভার্যা হতে দিল না।

সমুদ্রপাড়ে অর্জুনের অসম্পূর্ণ কুটীরের এক প্রান্তে বসে থাকতে থাকতে অর্জুন ও দ্রৌপদী তার মনের অনেকখানি জুড়ে বসল। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের উচ্ছলতা দেখার নির্মল আনন্দের মাঝখানে দ্রৌপদী যে কখন তার মনে জায়গা করে নিল কৃষ্ণ টের পেল না। নিজের অজান্তেই নিরুচ্চারে বলল, অর্জুন ও দ্রৌপদীর দাম্পত্য জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কোনো স্বার্থ ছিল না তার। তবু সেই অপ্রিয় কাজটি সম্পূর্ণ করতে তারও ভূমিকা ছিল। বিনাস্বার্থে কেউ কিছু করে

না। তাহলে তারও একটা স্বার্থ ছিল। স্বার্থের চরিত্রটা মনের আবরণ খুলে দেখার কথা মনে হলো। অবচেতন মনের গতি বড় অদ্ভুত। বাইরে থেকে সব সময় তার গতিপ্রকৃতি টের পাওয়া যায় না। মানুষ নিজেও জানে না তার মনকে। তাই মনের বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সে বড় অসহায়। বহুকাল পরে কৃষ্ণ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগল।

প্রভাসের সমুদ্রবেলায় নিরুচ্চারে নিজের কাছে শপথ করল, যা সত্য তা যতই নিষ্ঠুর এবং স্বার্থবিরোধী হোক অকপটে নিজের কাছে তা মেলে ধরবে। দ্রৌপদীর মতো নারীরত্নকে নিজের ভার্যা করে পাওয়ার তারও লোভ ছিল। ও যদি পিতৃস্বসা কুন্তীর কুলবধূ না হতো তাহলে ঘটনাটা কোথায় শেষ হতো বলা কঠিন ছিল। এরকম একটা উদ্ভট চিন্তায় কৃষ্ণ সহসা চমকাল। চমকিত বিস্ময়ে সারা রোমকূপে তার কাঁটা দিল। মনের অতলে দ্রৌপদীকে ভার্যারূপে পাওয়ার কামনা তারও ছিল তা-হলে? অদ্ভুত লাগল। এ এক অদ্ভুত আত্মসমীক্ষা।

বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে কৃষ্ণ নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার কারণও ছিল অনেক। বীর্যশুল্কার প্রতিযোগিতায় একজন সাধারণ প্রার্থীর সমতলে নিজেকে নামিয়ে আনলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। কৃষ্ণত্ব রক্ষা করতে হয়। সেজন্য অনেক ইচ্ছেই সংযত করতে হয়। এই অসাধারণত্ব যতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ততদিন মানুষের কাছে তার সমাদর। এ কারণে দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভর সভায় লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণ নাম লেখায়নি। কোনো কারণে লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হলে বহুদিনের প্রয়াসে গড়ে তোলা বীরত্বের খ্যাতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের গৌরব এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। তাই অবদমিত বাসনা সংযত করল কৃষ্ণ।

বিস্ময়ের সীমা নেই কৃষ্ণের। মনের এই রহস্যের সঠিক উৎসটা কোথাও না কোথাও লুকোনো ছিল, কেবল সে জানতো না। প্রভাসের নির্জন সৈকতে হঠাৎই তার অতল মনের অন্ধকার ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। বিস্ময়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল, বীর্যশুল্কা বিজয়ী ছদ্মবেশী অর্জুনের পিছু নেওয়ার তো কোনো দরকার ছিল না। তথাপি লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছন পিছন গেল। শুধুই কৌতূহল ছিল, না অন্য কোনো আকর্ষণ ছিল? উত্তরটা কৃষ্ণ নিজেই দিল। বীর্যশুল্কা বিজয়ীর ছদ্মবেশ তখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। সেটা জানার জন্যই সে পিছন নিয়েছিল। কুম্ভকার ভার্গবের গৃহে এসে জানল ছদ্মবেশী অর্জুন তার আপন পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তৈরি হয়নি। এমনকি কখনও দেখেনি তাকে। কোনোদিন তার খোঁজ খবরও করেনি। সংকটকালে কুন্তীও চায়নি বাপের বাড়ির

সাহায্য। আত্মীয় না জেনেই কৌতূহলবশত বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতেই কৃষ্ণ ভার্গব কুটীরে গিয়েছিল। কিন্তু যে চোখ দুটি তার নিজের দিকে ফেরানো মজা করার জন্য হঠাৎ কৃষ্ণকেই প্রশ্ন করল, নিশ্চয়ই অর্জুনের সঙ্গে আলাপ করতে ভার্গব গৃহে যাওনি। গিয়েছিলে দ্রৌপদীকে একবার চোখের দেখা দেখতে। তাকে নিয়ে মাতামাতি করে কোনো লাভ নেই জেনেও অর্জুনের পালের হাওয়া থেকে যদি কিছুটা হাওয়া দ্রৌপদীর জন্য কেড়ে নেওয়া যায় সেজন্যই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের ফন্দী করেছিলে।

এরকম একটা অদ্ভুত কৈফিয়তে কৃষ্ণ চমকাল। মানুষের নিজের মনটাও তার অধীন নয়। মাঝে মাঝে তার বিবেক মনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রভাসের সাগরবেলায় বসে মনকে দেখার সেই চোখটা পেল। এর নাম আত্মজ্ঞান। কৃষ্ণের মনে হলো সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো ফেনার মুক্তো ছড়িয়ে যেমন মাটির ঘ্রাণ নেয়, তেমনি এক আশাভঙ্গতার দুঃখে উত্তাল বুকটায় দ্রৌপদীর নামটা স্পন্দিত হতে লাগল। আর তাতেই জানা হলো দ্রৌপদীকে ভার্যা না করে পাওয়ার জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে অর্জুনের প্রেমকে, তার একার অধিকারকে সে আঘাত করল। সুযোগটা পিতৃশ্বসা কুন্তীই করে দিল তাকে। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হবে কি হবে না তার শেষ বিচারে ভার তাকেই দিল। কৃষ্ণ অবদমিত মনের ইচ্ছের দ্বারা চালিত হলো। নইলে তার একটু অসম্মতিতে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হত না। দ্রৌপদী অর্জুনের একার ভার্যা হতো। কিন্তু কৃষ্ণই সব বরবাদ করে দিলে। কুন্তীর ইচ্ছেকেই সমর্থন করে দ্রৌপদী ও অর্জুনকে একই সঙ্গে হতাশ ও নিরাশ করল। দ্রৌপদীর সুখকে ধারাল ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে ভাগাড়ের নিরিবিলিতে বসে দু'পায়ে চেপে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে কী সুখ পেল সে জানে না। বহুদিন পরে সে কথা ভেবে নিজেকে তার বড় দোষী ও অপরাধী মনে হল। হয়তো এমন ঘটনা না হলে দ্রৌপদীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা এত নিবিড় হত না। ভাগ্যের কাছে হেরে যাওয়া দ্রৌপদীর দুঃখে দুঃখী হয়ে কৃষ্ণ বলেছিল, আমি তোমারই থাকব। যখনই স্মরণ করবে যেখানেই থাকি, সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসব। কথা দিলাম। অঙ্গীকারের কথাগুলো তার বুকের মধ্যে ঘুঙুর হয়ে বাজছিল। দেহমন জুড়ে এক আশ্চর্য সুরের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। অজ্ঞাত রহস্যলোকের পর্দাটা সরে যেতে স্পষ্ট হলো দ্রৌপদীকে পাওয়ার লোভেই সেদিন পার্থের কাছ থেকে তাকে আলাদা করেছিল।

মাঝসমুদ্রের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কৃষ্ণ। মনে হল, জীবনটা নদীর মতো। যার জীবন যে খাতে একবার বয়, তার পক্ষে অন্য খাতে

তার ধারাটা বইয়ে দেবার উপায় থাকে না। সাগরেই নদীর শেষ। তারপর আর কিছু থাকে না তার। যা হবার হয়ে গেছে এই জীবনের মতো তার ও অর্জুনের জীবনে। ফেরার পথ তাদের নেই আর।

কৃষ্ণ চুপ করেছিল। এত গভীর করে দ্রৌপদীকে নিয়ে ভাবার অবকাশ হয়নি আগে। ঈর্ষা বশে সত্যিই সে অর্জুন ও দ্রৌপদীর জীবনকে শুধু নয়, পঞ্চ পাণ্ডবের জীবনকে তছনছ করে দিল।

অপরাহ্ণ গড়িয়ে এল। আকাশে সূর্যাস্তের আয়োজন। লাল, হলুদ, কমলা রঙের মেঘ জমেছে পরতের পর পরত। পূব আকাশে সন্ধ্যাতারার নিস্প্রভ আলোর দ্যুতি গোটা আকাশখানা বিধুর করে তুলেছে। সায়াহ্নের এই পটভূমিতে এক ঝাঁক সাদা বক মালার মতো উড়ে যাচ্ছিল পূব থেকে পশ্চিমে অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণে।

কৃষ্ণ উঠবে উঠবে করছিল। এমন সময় অর্জুন এল সেখানে। কৃষ্ণকে দেখেই তার সমস্ত চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কৃষ্ণ কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কৃষ্ণ। অমনি বুকের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। কী যেন নয়, পুরো বুক থেকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং অপরাধবোধের ভারটা নেমে গেল। তবু রাগ দেখানোর জন্য কৃষ্ণ এমন করে তাকাল যেন, তাকে চেনে না আদৌ। চোখের দৃষ্টি তার ঘোলা। মনে হচ্ছিল, কৃষ্ণ কিছুই দেখছিল না। এমন কি চারদিকের কোনো দৃশ্য, গন্ধ, শব্দও তার চেতনাকে স্পর্শ করল না। জোর করেই তার সমস্ত অনুরাগকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করে এক আশ্চর্য সংযমে স্তব্ধ হয়ে রইল।

অর্জুন কিন্তু রাগল না কৃষ্ণের আচরণে। বলল, দেনেওয়ালার ভালোবাসা যদি খাঁটি হয়, তাহলে লেনেওয়ালার সাধ্য নেই তাকে অবহেলা করার। ভালোবাসা ব্যাপারটা নিজেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বোধ। হৃদয় নিঙড়ে দিলেই হৃদয় ভরে ওঠে।

কৃষ্ণ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, এসব কথা তুমি ভাব না, ভালোবাসার শুধু ভান করো। তোমার মধ্যে সত্যি কোনো আন্তরিকতা নেই। থাকলে আমাকে এত কষ্ট দিতে না।

অর্জুনের অধরে মায়াবী হাসি। বুকে উচ্ছ্বাস। কৃষ্ণের অভিমানী জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, পথের দু'ধারে মন কেড়ে নেওয়া চমৎকার দৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড়, গ্রাম, জনবসতিহীন নিবিড় অরণ্যের মায়াবী হাতছানি। ওরই মধ্যিখানে বাস করে অভাবী, খেতে না পাওয়া মানুষ সব। বুক ভরা প্রেম তাদের। ভিক্ষের ঝুলি ভরে ওঠেছে ওদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দানে। আন্তরিকতার সে স্পর্শটুকু এখনও আমার বুকে লেগে আছে। বড় ভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে।

কৃষ্ণ একটুও খুশি হল না ওর কথায়। থমথমে গলায় বলল, তোমার এসব আদিখ্যেতা শোনার মন নেই আমার। নিজের সঙ্গে নিজের এই অভিনয় আর কতকাল করবে অর্জুন? তোমার নিজের চোখ যে তোমার ফাঁকির দিকে তাকিয়ে হাসছে তা যদি দেখতে পেতে তাহলে এভাবে আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে না। গদের সঙ্গে রৈবতকে গেলে না কেন? তোমার রাগ অভিমানের কথা আমার অজানা নয়। আমিও ভুলিনি। তবু যা করেছি তোমার ভালোর জন্যেই। ওসব কথা পরে হবে। এখন রথে ওঠো। রাতটা প্রভাসের প্রাসাদে কাটিয়ে কাল রৈবতকে রওনা হব। সেখান থেকে দ্বারকায় যাব। অগ্রজ বলরাম তোমার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

ভোর হতেই কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে রৈবতকে যাত্রা করল। পায়ে হাঁটা আঁকাবাঁকা পথের চিহ্ন ধরে রথে যেতে যেতে অর্জুন বলল, সারা জীবন ধরে পায়ে হেঁটেই বেড়ালাম। থিতু হয়ে বসা হল না। পথিক হয়েই থাকলাম। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, জানতে ইচ্ছে করে না। চলার আনন্দে মজে থাকি। পাথেয় কিছু নেই। সম্বল সহায় বলতে গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণ। এরাই আমার বিশ্বস্ত দুই সঙ্গী। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি শরও খরচ হয়নি। আহার, বিহার, আশ্রয় সব বনভূমিই দিয়েছে। বনভূমি আমার ধাত্রী। এই বন এবং বনভূমি অধ্যুষিত মানুষের প্রতি আমার এক ধরনের কৃতজ্ঞতা আছে।

আত্মমুগ্ধ গলায় কৃষ্ণ বলল, জানি। আমারও জীবনটা খুব সুখে কাটেনি। তবু এসব নিয়ে আমার কোনো আবেগ নেই। রসিয়ে বলার মতো বিলাসিতাও করি না। এ হল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। যা করেছ নিজের জন্যে করেছ। অন্যেরা তার সুফল পেয়েছে, এইটুকু।

অর্জুনের বুকের ভেতর অনেক কথা জমেছিল। কৃষ্ণের কথায় যতি পড়ল না। বলল, নিজেকে ফিরে দেখার একটা আত্মতৃপ্তি আছে। এই তৃপ্তিটুকু না থাকলে একজন মানুষের কাজের ইচ্ছেটাই মরে যেত। জীবনই তো দীপ, যার আলোয় চলার পথটা উদ্ভাসিত হয়, অন্ধকার আলোকিত হয়। শুধু তাই কি, অন্যের পথেও আলো ফেলে। এসব জায়গায় আগে আসা হয়নি। আমার কাছে এই স্থান সম্পূর্ণ নতুন। সব জঙ্গল যেমন বনজ গন্ধময় হয় এও সেরকম। জঙ্গলের মধ্যে লুকনো কত গ্রাম। যুগযুগান্তর ধরে এভাবে মানুষের বসতি টিকে আছে। একটা মিষ্টি সম্পর্ক নিয়ে গাছের মতো সমাহিত হয়ে আছে। তাদের সমতলে নেমে এসে, তাদের জীবনযাত্রার শরিক হয়ে এক নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছি। তবু সেই বিভোর স্বপ্নের মধ্যে স্বয়ম্বর সভায় জয়লব্ধা দ্রৌপদীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আমার নয়নপটে ভেসে উঠত। ভুলে থাকার কত চেষ্টা করেছি তথাপি পারিনি। অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের জন্য দ্রৌপদীকে এ জীবনে আমার পাওয়া হল না। দুঃখের কথা,

দ্রৌপদী আমার একার ভার্যা হোক, মা থেকে ভায়েরা এবং স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস এমনকি সখা তুমিও চাওনি। লুটের মালের মতো অগ্রজ থেকে অনুজ সবাই তার ওপর ভাগের থাবা বসাল। ভাগের ভাগ পাওয়ার আগেই ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকল। বারো বছরের নির্বাসিত জীবনে দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেরও কোনো সুযোগ রইল না।

কৃষ্ণের দু'চোখের চাহনি সহসা অপরাধবোধে নিবিড় হলো। অর্জুনের অভিযোগের কোনো প্রত্যুত্তর হয় না বলেই চুপ করে রইল। অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে মনটা পীড়িত হতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বিবেকতাড়িত হয়ে বলল, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। হয়তো এতে তোমার ও পাণ্ডবদের ভালো হলো। ঘরের দেয়াল ভেঙে এভাবে বেরিয়ে পড়া হলো বলে এক অন্য জীবন দর্শন হলো। সেই সঙ্গে ভারত দর্শনও। মানুষকে এই চেনার অভিজ্ঞতা তোমার কোনোদিন ফুরোবে না।

বহুকাল পরে কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে অর্জুনের মনের ভেতর অভিযোগ, অনুযোগের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। তাকে দমন করার ক্ষমতা ছিল না অর্জুনের। বলল, তোমরা সকলে মিলে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসের যে নিয়ম করলে তাতে আর কেউ নয় অর্জুনই বাঁধা পড়ল। কী বোকা আমি! শঠতাও বুঝি না।

বিস্ময়ে দীপ্ত হল কৃষ্ণের চোখ। বলল, তাই বুঝি? আমি ভাবলাম, হস্তিনাপুরের বাইরে মিত্রশক্তি সন্ধান করতে তুমি ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে এদেশ-সেদেশ করছ। পাছে তোমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে তাই ব্রাহ্মণের গরু উদ্ধারের গল্প ফেঁদেছ।

অর্জুন কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়, এ এক অন্য গল্প।

দ্রৌপদীর চোখের বাইরে থেকে তুমি মুক্তি খুঁজেছ।

দ্রৌপদী হল আমার এক বন্ধন। তার ওপর আমার কিছু দায়িত্ব আছে। সে আমাকেই বরমাল্য দিয়েছে। তাকে রক্ষা করা আমার ধর্ম। স্বামী হয়ে সে কাজ করতে না পারার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। সর্বক্ষণ নিজেকে দোষী এবং অপরাধী মনে হয়। স্বামীর কোনো কর্তব্য করিনি। ক্লীবের মতো আচরণ করে ঘরের শান্তি রক্ষা করেছি। অথচ আমার বীর্যাবর্তার কাছে তার অনেক প্রত্যাশা ছিল। স্বামীর কাছে সকল নারীর যে প্রত্যাশাটুকু থাকে আমি তাও পূরণ করিনি। পরিবারের স্বার্থে বীরোচিত উদারতায় তাকে ভাইদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিয়ে কার্যত নিজেকে এবং তাকেও হত্যা করেছি। আমার হাতে তার মরণ হয়েছে। এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাপুরুষের মতো তার কাছ থেকে পালিয়ে

এসেছি। এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আরও কতকাল বেড়াব কে জানে? বিশ্বাস কর আমার মনটা কিন্তু তার কাছে পড়ে আছে।

অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণ বলল, তোমার এই দুর্ভাগ্যের হেতু আমি। পিতৃস্বসা কুন্তীর অপমান যাতে না হয় সেজন্য তাঁকে সমর্থন করে আমিও ভুল করেছি। বলতে পার, আমিই তোমার জীবনটাকে বরবাদ করে দিলাম। দুঃখের কথা, তোমার ভাইরা কামপীড়িত হয়ে ভ্রাতৃবধূকে নিজের ভার্যা করে পাওয়ার জন্য যা করল সুরুচিসম্পন্ন কোনো ঘরে তা হয় না। আমার ভাবতেও ঘেন্না করছিল। দ্রৌপদীর জন্যই যে কোনো মুহূর্তে রোষের আগুন জ্বলে উঠতে পারত। রেষারেষিতে একটা বড় পারিবারিক যুদ্ধও হতে পারত। ভ্রাতৃদ্বেষ এবং পারিবারিক বিরোধ চাপা দেওয়ার জন্য পারিবারিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে তোমার বিপক্ষে গিয়েছি। এজন্য আমিও কম মর্মযন্ত্রণা ভোগ করছি না। এখন এসব কথা থাকুক। রৈবতকে গিয়ে শুনব। রথের চলমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছুটন্ত প্রকৃতিকে দেখ। একই জায়গায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৃতি সব কিছুকে পিছনে ফেলে ধাবমান জীবনপ্রবাহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। জীবনের পথে বেরিয়ে তেমনি পিছন ফিরে তাকাতে নেই। তাতে যাত্রাটা শুধু বিড়ম্বনার হয়। যা হওয়ার তা হবেই। বন্ধু, সবই তো জন্মের বহু আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তোমার আমার ভূমিকা নেই তাতে। আমরা শুধু ফলভোক্তা তার। জীবনটা শুধু চলার জন্য। চলতে চলতে নিজকে দেখা, খোঁজা, জানা, অনুভব করা। তুমি আসলে যে কী চাও নিজের কাছে এবং জীবনের কাছে এই জিজ্ঞাসা কোনোদিন শেষ হয় না।

কৃষ্ণের কথায় অর্জুনের রাগ অভিমান প্রশমিত হল। কৃষ্ণের আগে এমন সুন্দর করে কেউ তাকে জীবনের পাঠ দেয়নি। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার অন্তঃকরণ।

এরপর উভয়ে চুপচাপ রইল। দেখতে দেখতে তারাও রৈবতকে পৌঁছে গেল। দূর থেকে পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে কৃষ্ণের প্রাসাদশীর্ষে গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত বিশাল পতাকা দেখতে পেল অর্জুন। সেই দিকে দু'খানা চোখ পেতে রেখে নিজের মনে ভাবছিল। পতাকা যেন নীল আকাশের বুকে কৃষ্ণের গৌরব মহিমা মেলে ধরে সবাইকে রৈবতকে আহ্বান করছে।

রৈবতকে পৌঁছতে অর্জুনের দুপুর হয়ে গেল। শীতের মধুর দুপুর।

মুক্ত বাতায়নপথে শীতের কনকনে হাওয়া হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকছিল। এলোমেলো করে দিচ্ছিল ঘরের জিনিসপত্তর। জানলার কপাট বন্ধ করতে এসে

সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল। যৌবনদৃপ্ত একজন যুবককে কৃষ্ণের সঙ্গে নামতে দেখে একটু অবাক হল সে। দেহ তো নয়, কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা এক অনুপম ভাস্কর্য যেন। কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। সুভদ্রা তন্ময় হয়ে আগন্তুককে দেখছিল। কী অপরূপ তার কান্তি। নারীসুলভ পেলব দেহ। অপরূপ ঢেউ খেলানো চুল। মনে হচ্ছে একটা গোটা সাগরের ঢেউ যেন তার চুলে বন্দী হয়ে আছে। চোখে বিভোল যৌবনের বিভব। মনে হয় ঘুম লেগে আছে যেন। কী অসামান্য তার দীপ্তি! চলনেও কী দৃপ্ত ভঙ্গি! নাচের তাল-ছন্দ যেন পায়ে পায়ে হাঁটছে। পুরুষের মতো পুরুষ বটে। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা এমন যুবককে কার না ভালো লাগে? রমণীদের তো মন কেড়ে নেবেই।

নবাগত অর্জুনকে কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার ভীষণ ভালো লেগে গেল। তখনও ভালো করে জানে না নবাগত ব্যক্তি কে? চোখ জোড়া তার দিক থেকে সরিয়ে নিতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। কপাট আড়াল করে অর্জুনকে দেখতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার ভেতর যে একটা নিবিড় ভালোলাগার নেশা লুকনো আছে সুভদ্রা জানত না। এক আশ্চর্য তৃপ্তিতে ভরে উঠছিল তার ভেতরটা।

সুভদ্রার জানলা বন্ধ করা আর হল না। বাইরের উদ্দাম হাওয়া তার মনের অভ্যন্তরে এক ঝড়ের বার্তা বয়ে আনল যেন। নিজের কাছে তার বিস্মিত জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণের সঙ্গে ঐ নবাগত ব্যক্তি কে? ও কেন অতিথিশালায় থাকল না? ভাইয়ার সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক? এক রথে পাশাপাশি দু'জন যখন এসেছে একটা কিছু ব্যাপার আছে। ওর সঙ্গে কৃষ্ণের আচরণও অতিথির মতো নয়। বরং বন্ধুর মতো। অনেককাল পরে পরমাত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে যেমন করে অনেকটা সেরকম। শুধু তাই নয়, তাকে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢুকল।

গোটা ব্যাপারটা সুভদ্রাকে অবাক করল। কৃষ্ণের নবাগত বন্ধুকে কয়েকমুহূর্তের জন্য দেখায়। তাও সামনাসামনি নয়, দূর থেকে লুকিয়ে দেখা। তবু সামান্যক্ষণের এই দেখাতে একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছিল। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি অনেকক্ষণ ধরে তার মন ছুঁয়ে রইল। একটু দেখার জন্য জানলার গরাদ ধরে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুভদ্রা। হাজার কথার ঢেউয়ে তোলপাড় হচ্ছিল বুক। কিন্তু আগন্তুক তার চোখের সামনে কোথাও ছিল না। তবু বাতাসে তার গায়ের গন্ধ লেগেছিল। বুকের গভীরে তার অদৃশ্য উপস্থিতিটা টের পাচ্ছিল। অস্তিত্বের স্পন্দন অনুভব করছিল দেহ ও মনের যৌবনোচিত চাহিদায়। সুভদ্রার বিবেচক মনটি নিজেকেই জিগ্যেস করল। এ তার কীসের তৃষ্ণা? কোনো পুরুষকে দেখে তো আগে এমন চিত্তচঞ্চল হয়নি। নবাগতের অপূর্ব দুই চোখের

চকিত ছোঁয়ার শিহরনে মনটা এমন উতলা হল কি? মনের ভেতরটাও তার বদলে গেল কী করে? কৃষ্ণের বন্ধু বলেই কি তার এই ভাবান্তর?

অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছিল। তবু সুভদ্রার ভ্রূক্ষেপ নেই। এক অদ্ভুত অনাবিষ্কৃত অভিজ্ঞতা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। মনে হলো তার নিজের চোখ জোড়া তার নিজের দিকেই বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। উৎসুক অনুসন্ধিৎসু দু'চোখে এ কার প্রতীক্ষা? হঠাৎ তার হল কী? একবার দেখামাত্র তার এরকম ভাবান্তর হয় কী করে?

কৃষ্ণের নবাগত বন্ধুর পরিচয় উদ্ঘাটন করতে সুভদ্রার কয়েকদিন সময় লাগল। সেও এক গল্পের মতো। পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ এক ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ যুবার মধ্যে তাকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গুপ্তচরদের সংগৃহীত অর্জুনের চেহারার মধ্যে শুধু নারীসুলভ কমনীয় দেহসৌষ্ঠব নয়, এক অলোক সামান্য বীর্যাবর্তার আশ্চর্য সমন্বয়ও হয়েছিল বলেই তাকে অসংখ্য প্রতিযোগীর মধ্যে চিনতে কৃষ্ণের কষ্ট হয়নি। তার স্বাতন্ত্র্যদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং বীর্যাবত্তা কৃষ্ণকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণ জেনেছিল এই ছদ্মবেশী যুবা তৃতীয় কৌন্তেয় ছাড়া আর কেউ নয়। বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীও লক্ষ্যভেদে উত্তীর্ণ অর্জুনের সাফল্যকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করল। আশ্চর্যের কথা, অর্জুন কিংবা কুন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণের কোনোরূপ পরিচয় ছিল না। তাদের বাসস্থানে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই তাদের পরিবারের সদ্য উদ্ভূত একটি জটিল সমস্যার সঙ্গে কৃষ্ণ নিজেকে জড়াল। সদ্য বিজয়লব্ধ দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে পাছে ঝগড়া-বিবাদ হয়, পারস্পরিক রেষারেষি, ঈর্ষা-বিদ্বেষে ঐক্যহানি হয় তাই পাঁচপুত্রের সঙ্গে কুন্তী তার বিয়ের বন্দোবস্ত করল। কৃষ্ণও এই বিয়েটা সমর্থন করল। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হয়ে গেল।

গল্পটা শোনা থেকে অর্জুন সম্পর্কে তার সব কৌতূহল দপ্ করে নিভে গেল। অর্জুন জননী কুন্তী তারও পিতৃস্বসা। তবু তাঁর এ ধরনের অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে সুভদ্রা মেনে নিতে পারল না। একজন নারী হয়ে আর একজন নারীকে এভাবে অসম্মান করা এবং তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে একটি গর্হিত কাজ করতে বাধ্য করা সুভদ্রার একটুও ভালো লাগল না। কুন্তীর প্রতি মনটা বিরূপ হল। এক ধরনের অশ্রদ্ধাও হল। জননীর মতো কাজ করেনি। কোনো স্নেহান্ধ জননীও পুত্রদের লাম্পট্য, কিংবা নীতিহীন, অসামাজিক কার্যকলাপের সমর্থনে নিন্দিত আচরণকে

মহত্তর আদর্শের মোড়কে মুড়ে দেয় না। কিন্তু পিতৃস্বসা কুন্তী তাই করল। পাণ্ডব পরিবার বধূর কোনো সম্মান দেয়নি দ্রৌপদীকে। তাই এত হেনস্তা হতে হল তাকে। এজন্য অর্জুনের ওপর রাগ হল। বিপন্ন স্ত্রীর হেনস্তা ও সম্মান রক্ষার্থে সে কিছুই করল না। পাণ্ডব পরিবারের নীতিহীন আচরণ সুভদ্রাকে ক্ষুব্ধ করল। প্রথম দর্শনে অর্জুনকে না জেনে তার প্রতি যেটুকু মোহ জন্মেছিল তা তলানিতে গিয়ে ঠেকল। সেই সংগে রৈবতকে থাকার আকর্ষণও ফুরোল। অর্জুনের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যই রাজধানী দ্বারকায় ফিরে যাবে বলে স্থির করল।

কিন্তু যাবে বললেই তো আর যাওয়া যায় না। অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কৃষ্ণের অনুমতির জন্য কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামাকে পাঠাল সুভদ্রা। কৃষ্ণ সব শুনে হাঁ-না কিছুই না বলে প্রিয় ভগিনী সুভদ্রার কক্ষে প্রবেশ করল। কারণ, এসব ব্যাপারে কৃষ্ণের নিজস্ব একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে। স্ত্রীলোক হয়েও সত্যভামা ননদিনীর মনের কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। কিন্তু কৃষ্ণ পুরুষ হয়ে ভগিনীর মনের কথাটা অনুভব করল। তাই তাকে নিরস্ত করতেই ভগিনীর কক্ষে গেল। ভগিনীর যাত্রাকে বাধা দিতে নয়, তার মনের অয়নপথটি বিচার করে ঠিক পথে তাকে চালিত করতে কৃষ্ণ ভগিনীর পাশে দাঁড়াল।

আচমকা কৃষ্ণকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকাল সুভদ্রা। যুগপৎ লজ্জা এবং অপরাধবোধে কৃষ্ণের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। সংকোচে, সংশয়ে ভেতরটা কুঁকড়ে গেল। এক দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, যে কথা নিজে বলতে পার সে কথা অন্যকে দিয়ে বললে কেন? দ্বারকায় যেতে চাইছ ভালো কথা, কিন্তু কেন যেতে চাও তার তো একটা কারণ আছে। ছোট্ট করে বলো, রৈবতক থেকে যেতে চাও কেন? আমার ওপর যদি অভিযোগ থাকে মন খুলে বলো।

সুভদ্রা ইতস্তত করতে লাগল। দেবার মতো কোনো জবাব তার মনে পড়ল না। সারা শরীর তার ঘামছিল। মনে হলো কৃষ্ণর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই, কেমন একটা নিরুপায় অসহায়তা নিয়ে চোখ দুটি মেলে ধরল ভাইয়ার চোখের ওপর। মিন মিন করে বলল, মনটা ভালো নেই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। মার জন্য মন কেমন করছে।

কৃষ্ণের অধরে দুষ্টু হাসি। ভাসা ভাসা চোখ দুটি ভগিনীর চোখের ওপর মেলে ধরে আদর করে থুতনিটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে বলল, মাগো তোমার ছোট্ট খুকু কিচ্ছু বোঝে না।

ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় অমনি সুভদ্রা ভেংচি কেটে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে বলল, ছোট্ট খুকু কিচ্ছু বোঝে না। তারপর একমুহূর্ত থেমে ঝঙ্কার দিয়ে বলল, কিচ্ছু বোঝেই না তো।

কৃষ্ণের দু'চোখ কৌতুক ঝলকে উঠল। কেটে কেটে বলল, চোখে ও কার ছায়া? ও কে? কার ভয়ে পালাই পালাই করছ? নিজের কাছে কিছু একটা লুকোনোর চেষ্টা করছ?

লুকোনোর মতো কোনো কাজ করিনি। সদর্পে কৃষ্ণের মুখের ওপর কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে জানলার দিকে সরে গেল সুভদ্রা।

কিন্তু ভগিনী তোমার কালো কাজল চোখে এত বিরক্তি বিতৃষ্ণা জমল কেন? ওটা কিন্তু লুকোতে চাইলেও লুকোনো যায় না। যদি তুমি না বল, তা হলে বুঝব ওটাই তোমার রৈবতক ছাড়ার একমাত্র অজুহাত।

বামাল সমেত চোর ধরা পড়লে যেমন হয় সুভদ্রারও তাই হল। তার মুখের রঙ কালো হয়ে গেল। মুখখানাও সহসা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মুখে তক্ষুনি কথা জোগাল না। কিছু বলতে হয় বলে জবাবে বলল, সব মানুষের মন কোনো না কোনো কারণে খারাপ হয়। সব কারণ সকলের কাছে বলা যায় না। বলতে নেইও। ভাই হলেও না। কার যে কোথায় কত ধরনের শূন্যতা থাকে, বেদনা থাকে, ক্ষোভ থাকে, দুঃখ থাকে সে নিজেও ভালো করে জানে না, কিংবা অনুভব করতে পারে না। যা তার নিজের কাছে স্পষ্ট নয় তাকে অন্যের কাছে স্পষ্ট করবে কী করে? তাই বলে তো মন খারাপের কষ্ট আর মিথ্যে নয়। আবার তাকে অবজ্ঞা করবে তাও নয়।

ভগিনীর বাকচাতুর্যে কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, আমার ওপর তোমার রাগ অভিমান কেন?

আমি একটা মেয়ে। আমার মতো অন্য একটা মেয়ের ওপর তুমি কিছু অন্যায় করেছ। সে তোমার বান্ধবী। তবু তার কোনো উপকারে লাগনি তুমি। বরং, তার অপকার করেছ কিছু। বলতে পার, রাগটা সে কারণেই। কারণ ঐ মেয়েটি বড় হতভাগা। তার দুর্ভাগ্যের জন্য যে দায়ী তাকে পরম মিত্র ভেবে তোমার শোবার ঘরে তুলেছ। এই লোকটার ভীরুতা, দুর্বলতা, নীতিহীন, অমানবিক কার্যকলাপে আমার নারী মন ক্ষুব্ধ হওয়াটা কী খুব অন্যায়? তার সমব্যথী হওয়াই তো স্বাভাবিক। তার মনে কোথায় দুঃখ, কোথায় যন্ত্রণা মেয়ে হয়ে আমি যতটা বুঝব—

কথার মধ্যে বাধা দিয়ে কৃষ্ণ বলল, তোমার অভিযোগের আঙুলটা কার দিকে

তোলা বুঝতে পারছি। কিন্তু তার দোষ কী? নির্লিপ্তভাবে একটা নীতিহীন ঘটনাকে মেনে নেওয়া অপরাধ। অসহায় বান্ধবীর পাশে না দাঁড়ানোটা তোমারও অপরাধ। একটা গোটা পরিবার একজন নারীর সম্ভ্রমহানি করল অথচ একজন পুরুষও এগিয়ে এসে বলল না, এটা অন্যায়, একটা জঘন্য নীতিহীন ব্যাপার। তোমার কাজের প্রতিবাদ করতেই রৈবতক ছাড়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এখানে আর একদণ্ড ভালো লাগছে না। প্রতিক্ষণ দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্য আর অসম্মান আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কৃষ্ণের অধরে কৌতুক হাসি অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। বলল, কী ব্যাপার বলো তো বোন? দ্রৌপদীর অজুহাত দেখিয়ে রৈবতক ছাড়ছ বিশ্বাস হয় না। তাকে তো চোখে দেখোনি। শুধু নাম শুনে এত অনুরাগ? মনের গতি বড় বক্র। দ্রৌপদী জয়ী অর্জুনের সঙ্গে তোমার আলাপ হলে কিন্তু এ রাগ জল হয়ে পার্থের সমুদ্রে গিয়ে মিশবে।

সুভদ্রা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, ধ্যাৎ। আমি কি তাই বলেছি?

সব কথা কী বলতে হয় বোন। কিছু কিছু কথা বুঝে নিতে হয়।

দুর। আমি থাকব না। রাগ দেখিয়ে সুভদ্রা চলে যেতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তার হাতখানা ধরে ফেলল।

বলল, আচ্ছা বাবা, তুমি বলনি, আমি বলেছি। হলো তো। তোমার মতো সত্যভামারও একই অভিযোগ। অথচ, কোনো দোষ না করে সবার চোখে দোষী হয়ে গেছি আমি। বিশ্বাস করো দ্রৌপদী যে অর্জুনের ভার্যা হতে পারল না তার জন্য দায়ী যুধিষ্ঠির এবং পিতৃস্বসা কুন্তী। ওরা মায়ে-পোয়ে মিলে নিজেদের ঘরে আগুন লাগাল। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। আমি মুখ বন্ধ করে থাকলেও এটা ঘটত। মুখ খুললে যুধিষ্ঠির, কুন্তীর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। কুন্তীর কথা হল দ্রৌপদীকে নিয়ে একদিন এ পরিবারে আগুন জ্বলতই। তাই পাঁচ ভাইয়ের ভার্যা করে সেই আগুনটা নেভানো হল। আমি তাতে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়েছি মাত্র।

তোমার কথার মানে বুঝলাম না।

দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে পাণ্ডুপুত্রেরা তাকে পাওয়ার জন্য শুম্ভ নিশুম্ভের মতো ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করে মরত। পাঁচ পুত্রের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে কুন্তী পাঁচ পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরাল। যে আগুন পরে লাগত, সে আগুন থেকে আগুন নিয়ে

কুন্তী ঘরের আগুন ও মনের আগুন একসঙ্গে নেভাল। এটা কিন্তু কুন্তীর ভালো সিদ্ধান্ত।

একে তুমি ভালো সিদ্ধান্ত বল!

হ্যাঁরে, দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পরে পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করছে। মৃত পাণ্ডবেরা জীবিত হয়ে ফিরছে। এটা একটা বিশাল খবর। একে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তাদের আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক করা উচিত বলে মনে করেছিল কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ের সংবাদটা দাবানলের মতো যত দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ল অন্য কোনোভাবে তা পড়ত না। মানবিক দিক দিয়ে সিদ্ধান্তটা যত নিষ্ঠুর অমানবিক হোক না কেন, রাজনীতির বিচারে তার সম্ভাবনাময় সাফল্যকে সমর্থন না করে থাকতে পারেনি। আমার সমর্থন না পেলেও দ্রৌপদী অর্জুনের একার ভার্যা হত না। এর ভেতর আমার কোনো ভূমিকা নেই, এমন কি ইন্ধন জোগানোর মতোও কিছু করিনি। আমি শুধু পাণ্ডব জননীর সিদ্ধান্তের সপক্ষে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই গোষ্ঠী বিবাহ নতুন কিছু নয়, এর আগেও হয়েছে। শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। পুরনো আত্মীয়তা পুনরুদ্ধার করা এবং তাদের নিষ্কলুষ ভাবমূর্তির সহায়তায় বৃহত্তর ভারতে যাদব সমবায় রাজ্যের একটা নিজস্ব স্থান করা ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ আমার ছিল না। এজন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তা-হলে আমি দোষী।

সুভদ্রা বলল, আমার মনে আর কোনো রাগ নেই। অভিমানও নেই। তবে তোমার বন্ধু, দ্রৌপদীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য করেনি। তাকে রক্ষার জন্য একটি কথাও খরচ করেনি। অথচ, সে একটু বেঁকে দাঁড়ালে দ্রৌপদী পাঁচজনের ভার্যা হত না। তার কাপুরুষতার জন্যই দ্রৌপদীকে এই হেনস্তা ভোগ করতে হল। এরকম একটা নীতিহীন, বিবেকহীন, দায়িত্বহীন মানুষ যে কী করে তোমার বন্ধু হল জানি না বাপু। আমি হলে এমন মানুষের ছায়া মাড়াতাম না।

কৃষ্ণর অধরে বিচিত্র হাসি ধীরে ধীরে বর্তুল হল। চোখেও তার কৌতুক। বলল, এটাই তোমার রৈবতক ছাড়ার কারণ তাহলে।

জানি না। এবার আমায় দ্বারকায় যেতে অনুমতি দাও। বিশ্বাস করো, মার জন্য মনটা সত্যি ব্যাকুল হয়েছে।

কৃষ্ণ বলল, এটা তোমার বাহানা। যাই হোক, আর কিছুদিন পরে তো দ্বারকায় যাচ্ছি। একসঙ্গেই যাব। এ'কটাদিন না হয় রৈবতকেই থাকলে।

সুভদ্রাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কৃষ্ণ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

দুই

অগত্যা সুভদ্রাকে রৈবতকে থাকতে হল। কৃষ্ণের খুব ইচ্ছে অর্জুনের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। এখানে তাদের মেলামেশা হোক, পরস্পরকে জানুক—এটাই ছিল কৃষ্ণের অন্তরের কথা। দ্বারকার স্বার্থে বিয়েটা চেয়েছিল কৃষ্ণ।

কিন্তু সুভদ্রা ও অর্জুন পরস্পরে মামাতো বোন আর পিসতুতো ভাই। সামাজিক ভাবে এই বিয়ে হয় না। পরিবারের লোকজন কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নেবে না। কিন্তু বৃষ্ণিবংশের স্বার্থেই পাণ্ডবদের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্কটা পাকা করলে দ্বারকাই লাভবান হবে। ভারত রাজনীতিতে তারাই একমাত্র নিরপেক্ষ রাজশক্তি। সেকারণে তাদের একটা আলাদা মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে।

কার্যত, বৃহৎ ভারত রাজনীতিতে জরাসন্ধ রাষ্ট্রজোট পাঞ্চাল ও যাদব সমবায় রাষ্ট্রজোটকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যুধিষ্ঠিরের মতো নির্বিরোধী এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির রাষ্ট্র নায়কের মূল্য খুব বেশি। রাজনৈতিকভাবে যাদব সমবায় সঙ্ঘের মিত্র রাষ্ট্র বলতে পাঞ্চালই ভরসা। পুব থেকে পশ্চিম কিংবা উত্তর থেকে দক্ষিণে একটি রাষ্ট্রও নেই যাকে দ্বারকা মিত্র বলে দাবি করতে পারে। এরকম একটা অসহায় অবস্থায় পাণ্ডবেরা তাদের পক্ষে থাকলে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে। এই লাভটাকে পাকাপাকি করতেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। সর্বক্ষেত্রে একটা বন্ধন চাই। বন্ধন ছাড়া শিথিল হয়ে যায় সম্পর্ক। যদুবংশের কেউ সে কথাটা বোঝে না বলে সব ভাবনা কৃষ্ণকে একা ভাবতে হয়। মায়ের মতো কৃষ্ণ তাদের এত বেশি আগলে রাখে যে রাষ্ট্রনায়কদের ভাবার কিছু থাকে না। হঠাৎ করে জটিল কিছু ভাবতে গেলে বুদ্ধিটাই খেলে না। তাই কৃষ্ণকে একা ভাবতে হয়।

গোটা ভারতবর্ষে বিবাদ, বিভেদের যে তপ্ত রাজনীতি চলছে তাতে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। সদ্ভাবের পরিবেশ বিষিয়ে উঠছে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থা আরো কিছুদিন চলতে থাকলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই একটি বৃহৎ রাষ্ট্রজোটের অধীনে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করে একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশে সকলের সঙ্গে সকলে মিশে নাগরিকেরা শান্তিতে বাস করুক এই স্বপ্ন নিয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় হারানো পাণ্ডবদের সন্ধানে গিয়েছিল কৃষ্ণ। কারণ নির্জোট পাণ্ডবদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিই পারে তার স্বপ্নের ভারতরাষ্ট্র গঠন

করতে। কৃষ্ণের মনে হয়েছিল পাণ্ডবেরা বেঁচে আছে। তাদের মৃত্যু নিয়ে যে রটনা আছে তা সত্য নয়। পারিপার্শ্বিক বিবিধসূত্র থেকে কৃষ্ণ অবহিত হয়েছিল যে, জতুগৃহে যারা মারা গিয়েছিল তারা কেউই পাণ্ডব নয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণেরা যে পাণ্ডব, কৃষ্ণ তা অনুমান করেছিল। অর্জুনের সফল লক্ষ্যভেদে কৃষ্ণের অনুমান যথার্থ হল। তাই, কালক্ষয় না করে বিপন্ন রাজ্যচ্যুত নির্বান্ধব পাণ্ডবদের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ তাদের হৃদয় জয় করে নিল। তাদের রাজ্য প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে একটা ভূমিকাও নিল। কৃষ্ণ জানে, তার এই অযাচিত বন্ধুত্বকে পাণ্ডবেরা কোনোদিন ভুলবে না। রাজনৈতিকভাবে পাণ্ডবদের লোকহিতৈষণা, জনপ্রিয়তা, লোকরঞ্জনের ক্ষমতা, বীর্যবর্তা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে সে যাদবদের একক কর্তৃত্বাধীনে এক ভারতরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখল। সেই মুহূর্তে এক পলকের জন্য ভগিনী সুভদ্রার ঢলঢল মুখখানি কৃষ্ণের মনের কোণে উঁকি দিয়ে তক্ষুণি মিলিয়ে গেল। কেন জানি না, প্রিয়তম ভগিনীকে তার মহাযজ্ঞের সমিধ মনে হয়েছিল। মুখে যাই বলুক, দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হওয়ায় কৃষ্ণ খুশি হয়েছিল।

মানুষের মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। দ্রৌপদীকে না পেয়ে অর্জুন যখন ভগ্নমনোরথ, নিদারুণ দুঃখে কাতর, তখন প্রিয় বন্ধুর সব কষ্ট, যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবার জন্য সুদূর দ্বারকা থেকে প্রিয়তম ভগিনী সুভদ্রাকে রথে করে উড়িয়ে আনল। সেই সময় থেকে কল্পনা করে আসছিল সুভদ্রা ও অর্জুনের বিয়ে হচ্ছে। অর্জুন তার করপদ্ম দুটি হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে গদ গদ কণ্ঠে বলছে; ওগো বধূ জীবনের দীপখানি জ্বালো। "আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী।"

কথাগুলো বাতাসের স্বরে অর্জুনের কানে কানে কে যেন বলল, আর কৃষ্ণ তাতেই চমকাল। কিন্তু কী আশ্চর্য! অর্জুনকে কোথাও দেখতে পেল না কৃষ্ণ। তা-হলে এ কার কণ্ঠস্বর? ঠিক সেই সময় আচমকা এক ঝলক কুচুটে বাতাস এসে ওলোট-পালোট করে দিল তার কোঁকড়া চুল। চোখ তুলে কৃষ্ণ দেখল, দূর দিগন্তে এক খণ্ড সাদা মেঘ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু বাতাস এসে কিছুক্ষণের জন্য খড়কুটো নিয়ে ছেলেখেলা করে গেল। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করছিল কথাগুলোর রম্যতা। আর সে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দেখতে পাচ্ছিল এক অনাগত ভবিষ্যতকে, যার সামনেও নেই, পিছনও নেই। কয়েকদিন ধরেই মনে, এই ভাবনাটা যাওয়া আসা করছিল। কিন্তু তার সঠিক কোনো জবাব পাচ্ছিল না। কেবল চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছিল সুভদ্রার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ভরা সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোয়া মুখের পাশে অর্জুনের দেবতার মতো

নির্মল নিটোল মুখ, তার চেহারার দীপ্তি, তার স্থির গম্ভীর কণ্ঠের ভাষা। আমি অর্জুন। বীরের রক্ত আমার শিরায়, জয়ে আমার জন্মগত অধিকার। আমি হারতে জানি না। আমি শুধু জয় করতে এসেছি।

অর্জুনের বুকে প্রেমের নির্ঝর। নারী তার কাছে অমৃতময় প্রেমের দীপশিখা। তার যাত্রাপথের আলোকবর্তিকা। অর্জুন ব্রহ্মচর্য জানে না। প্রেমহীন ব্রহ্মচর্য তো অরণ্যের আগুন। নিজে নিজে পুড়েই ছাই হয়ে যায়।

অর্জুন নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে সত্যি কিছু নেই। রাজার ঐশ্বর্য সে দেয় না। বীরের মর্যাদায় গৌরব দেয় না। বুকে শুধু মরুভূমি সৃষ্টি করতে পারে। দুরন্ত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে কোন কুসুম ফোটাবে সেখানে? অথচ জীবনের যে শ্রেষ্ঠ ফুল তার বুকে প্রেম হয়ে বিরাজ করছে, তার মধুরতম মধু যে নারী, যে অমৃত তার বুকে তার সাধনাই অমৃতের সাধনা। সে সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার নামই জীবন। ব্রহ্মচর্যে যদি যে রমণী কুসুমের পুজো না হয় তাহলে তার সাধনা করে কী হবে? কোন স্বর্গের সন্ধান দেবে সে? জীবন দিয়েছেন যিনি, প্রেমও দিয়েছেন তিনি। তিনিই চেয়েছেন প্রেমের সন্ধান কর প্রেমময় হৃদয়ে। নইলে, তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তো শুধু মুখের কথা। অর্জুন তার অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে জেনেছে ব্রহ্মচর্য হল সংযত জীবনযাপন। দেহের শক্তিতে নারীর দেহকে বন্দী করা নয়, প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে অনুরাগের বাঁধনে নারী প্রেমিকা হয়। তাই প্রেম পেতে অর্জুন প্রেমিক হয়েছে। প্রেমের সন্ধান করেছে প্রেমময় হৃদয়ে।

দেশ থেকে দেশান্তরে মুসাফিরের মতো ঘুরে ঘুরে অর্জুন প্রেমের সন্ধান করে বেড়িয়েছে। বোধ হয় সেই আকাঙ্ক্ষার চাঁদ এখন হাতে পাওয়া হয়নি। তাকে পাওয়া যে অমনি অমনি হয় না কৃষ্ণের চেয়ে বেশি কে তা জানে? প্রেমে যেমন সুখ আছে, দুঃখও আছে তেমন। আনন্দ যত আছে দুঃখও আছে ততো। শ্রেষ্ঠ প্রেমিক না হলে শ্রেষ্ঠ নারীর প্রেম পাওয়া হয় না। বহুকাল পরে হঠাৎই বৃন্দাবনের শ্রীরাধার শ্রীময় বিধুর মুখখানা তার মন ছুঁয়ে রইল। মনে মনে দ্রুত কত কথা হয়ে গেল। সুন্দরের সে অপূর্ণ অনুভূতি ক্ষণেকের জন্য হৃদয় মন জুড়ে সুরের তরঙ্গ তুলল। কৃষ্ণ আশ্চর্য হল, মনের সমস্ত তারগুলি আজও রাধার প্রেমের সুরে বাঁধা। মনে মনেই বলল, 'ধায় কেন মোর সকল ভালোবাসা তোমার পানে, তোমার পানে।' এক গভীর অতৃপ্তি থেকে বুকের কলধ্বনিতে উদ্দাত হল, রাধা আমি আর কোনো প্রেমকে তোমার চেয়ে বড় হতে দেব না।" কথাটা মনে মনে শুধু আওড়াল না, নিজের অজান্তে একটা প্রশ্নও করল নিজেকে—অর্জুনও কী তার মতোই

দ্রৌপদীর প্রেম ভালোবাসার চেয়ে অন্য কোনো নারীর প্রেম, অনুরাগকে বড় হতে দেবে না তার কাছে?

অর্জুনের কথা অবশ্য আলাদা। দ্রৌপদীর সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই বিসর্জনের বাজনা বেজেছিল। শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল তাকে অরণ্যে। তাই মনটা অস্থির। মনের শূন্যতা তার ঘোচেনি। প্রেমের ফেরিওয়ালা হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরেছে। তবু মনের মানুষ পাওয়া হল না তার। এই অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার, এই চির অতৃপ্তির কোনো নাম নেই। কিন্তু মনের মন ঠিকই একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে হবে তার একান্ত একার। সত্তার যে অংশ নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেনি উলুপী কিংবা চিত্রাঙ্গদার কাছে, তারই বেদনা নিয়ে প্রভাসের সুনীল সাগরতীরে এসেছে নিজেকে শান্ত করতে এবং শান্তি পেতে। কিন্তু সে শান্তি একমাত্র সুভদ্রাই দিতে পারে তাকে। তার সন্ধ্যাদীপ শিখার মতো স্নিগ্ধ ও জ্যোতির্ময় প্রেমের ছোঁয়ায় অর্জুনের চিত্তদেশ আন্দোলিত হবে। স্পন্দনহারা শীতল তুষারের মতো অজুর্নের প্রেম সুভদ্রার প্রেমের উত্তাপে প্রাণপ্রবাহিনী হয়ে প্রণয়সাগরে ভাসবে।

কিন্তু কৃষ্ণের মনে যে ইচ্ছেই থাকুক সুভদ্রার জন্য সব থমকে ছিল। এই ভগিনীকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। ভীষণ চাপা আর ব্যক্তিত্বময়ী। এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমতীও বটে। মানুষের মনের গভীরতা পরিমাপ করার এক আশ্চর্য মেধা আছে তার। চোখের চাহনি দেখে বক্তার মনের গতি প্রকৃতি বুঝে নিতে পারে। তাই, কৃষ্ণ তার সঙ্গে কথা বলার সময় খুব সাবধান থাকে। এই বোনটির চোখে ধরা পড়ে গিয়ে কোনোভাবে নিজেকে ছোট করতে চায় না সে। আবার তার অভিসন্ধিটা সুভদ্রা ধরে ফেলুক তাও চায় না। সেজন্য সুভদ্রার মনের কথাটা বুঝতে তার দেরি হচ্ছিল না।

অর্জুন সম্পর্কে সুভদ্রার মনোভাব খুবই স্পষ্ট। সামান্য দু'চার কথা যা হয়েছে তাতে অনুরাগের চেয়ে বিরাগই বেশি। বিরাগ মন্দ কিছু নয়, প্রেমের প্রথম রাগিণী। তবু, একটা সংশয় কৃষ্ণের থেকে যায়। অর্জুন সম্পর্কে সুভদ্রার কৌতূহল আছে, কিন্তু গভীর করে জানার ইচ্ছেটা নেই। হয়তো ইচ্ছেটা মরে গেছে। অথবা, তার সম্পর্কে জানার আগ্রহে ভাটা পড়েছে। সত্যভামাকে বলেছে, অর্জুনকে বিশ্বাস করা যায় না। তার বুকে প্রেম ভালোবাসা নেই। থাকলে দ্রৌপদীর মতো বরনারীকে অন্যের ভার্যা হতে বাধা দিত। কিন্তু অর্জুন তা করেনি। স্বামীর ওপর মেয়েদের যে নির্ভরতা এবং আস্থা থাকে, অর্জুন কার্যত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

স্বামীর কোনো কর্তব্য করেনি। ক্ষাত্রধর্ম পালন করেনি। খেলার পুতুলের মতো জননী তাকে নিয়ে শুধু খেলেছে। অর্জুন বড় বড় শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন ব্যক্তিই হোক, আসলে কাপুরুষ সে। এমন পুরুষের বাইরেটা দেখে কেউ তার ওপর নির্ভর করলে ঠকতে হবে তাকে। দ্রৌপদীকে পস্তাতে হলো বলে তার জন্য দুঃখ হয়।

সুভদ্রার অভিযোগ আরো ভয়ংকর। অর্জুনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা উগরে দিয়ে সত্যভামাকে বলেছে, অর্জুন হল ভীষণ স্বার্থপর। এ পৃথিবীতে নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না। রমণী হল তার খেলনা। তাদের সঙ্গে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা করে। যখন খেলায় আর মজা থাকে না তখন তাকে ফেলে অন্য খেলা খোঁজে। তার বাইরেটা দেখে যে মজে তার কপালে দুঃখ থাকে। জেনেশুনে স্বেচ্ছায় তাকে প্রেমাস্পদের আসনে যে বসায় সে বোকা। আমার ভাইয়ার মতো বিচক্ষণ মানুষের সমাদর পাওয়ার যোগ্য নয় সে, তবু তাকে নিয়ে ভাইয়ার এই মাতামাতি আমার একটুও ভালো লাগে না।

অপছন্দের কথা বলতে সুভদ্রা একটুও দ্বিধা করেনি। অর্জুনকে সমস্ত অন্তর থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলেছে। সেজন্যই ভাবনা হয় কৃষ্ণের। অথচ, অর্জুনের সঙ্গে তার বিয়ের যে ছবিটা সে মনে মনে এঁকে রেখেছে তার কী হবে? এই বিয়েটা সুভদ্রার জন্য নয়, ভারত রাজনীতিতে তার ও যাদবরাজ্যের একটা জায়গা করে নেওয়ার জন্য অর্জুনকে তার খুব দরকার। সেজন্য একটা বন্ধন চাই। এই বন্ধনই ধরে রাখে সম্পর্ক। নইলে শিথিল হয়ে যায়। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হলে এই সম্পর্ক ভেঙে পড়বে না। কিন্তু তার চাওয়াটা যে সব নয় কৃষ্ণ জানে।

পরিবারের মধ্যে তাকে নিয়ে একটা উলটো হাওয়া বইছিল। অর্জুন তার পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র হলে কী হবে? যাদবদের অনেকেই তার সম্পর্কে অত্যন্ত হীন মনোভাব পোষণ করেন। পাণ্ডব মানেই দীনহীন ভিখারী। সহায় সম্পদ বলতে তাদের কিছু নেই। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজকীয় মর্যাদা উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্জিত নয়। কৌরবদের দয়া, করুণা ও অনুগ্রহের দান। কৃষ্ণ ছাড়া এই অনুগ্রহটুকুও পাওয়া হতো না। সুতরাং, তাদের নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। এইসব কারণে যাদব প্রধানেরা অর্জুনের প্রতি তুষ্ট নয়। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠত্বের আত্মাভিমানও সুভদ্রা ও অর্জুনের বিয়ের অন্তরায়। কৃষ্ণের সাধ্য থাকলেও সাধ নেই অন্তরায়ের প্রাচীর ভেঙে অর্জুনকে সুভদ্রার কাছে পৌঁছে দেয়ার। তাই খুব সাবধানে প্রচ্ছন্ন থেকে উভয়ের পরিণয়ের জমি প্রস্তুত করতে লাগল।

তিন

বলরামের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক ভালো। কিন্তু সুভদ্রা ও অর্জুনের বিয়ে হোক এটা চায় না। সেরকম কোনো ভাবনা চিন্তাও ছিল না তার। রাজারাজড়ার ঘরের ছেলে মেয়ের বিয়ে নিয়ে যে রাজনৈতিক বন্ধন হয় সেটাও বলরাম ভালো বোঝে না। বিয়ের মতো নরনারীর একটা মধুর চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে কোনো রাজনীতি খুঁজতে চেষ্টাও করে না। তাই, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সুভদ্রাকে কৌরব বংশের পুত্রবধূ করতে চায়। প্রিয় গদা শিক্ষার্থী দুর্যোধন তার মনোনীত পাত্র। গদাবিদ্যায় দুর্যোধনের পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ আপন ভগিনীকে তার হাতে অর্পন করবে ভেবে রেখেছে। বংশ মর্যাদায়, কৌলীন্যে, শ্রেষ্ঠত্বে এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে দুর্যোধনের সমতুল ব্যক্তি নেই বললেই হয়। যদুবংশের সঙ্গে কৌরবদের সুসম্পর্ক নেই জেনেও বলরাম সুভদ্রা ও দুর্যোধনের বিয়ের ব্যাপারে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে গেছে। যাদবদের সঙ্গে কৌরবদের সুসম্পর্ক স্থাপনের কথা ভেবেই দুর্যোধনকে ভগ্নীপতি করার আগাম অনুমতিও নিয়েছে জননী রোহিণী ও পিতা বলদেবের কাছ থেকে। এ অবস্থায় কৃষ্ণের পক্ষে অর্জুনের হয়ে কিছু বলতে গেলে একটা পারিবারিক অশান্তি হতে পারে, তাই সংঘর্ষের পথ পরিহার করে কৃষ্ণ অন্যভাবে বলরামের মন পাওয়ার জন্য বলল, বহুকাল পরে অর্জুন এসেছে মাতুলালয়ে। অথচ এখানে সবচেয়ে অপরিচিত সে। আমি এবং তুমি ছাড়া আর কারো সাথে তার আলাপ পরিচয় নেই। তাই বলছিলাম কি, সকল গণ-মুখ্যদের সঙ্গে, আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে অর্জুনের আলাপ-পরিচয় করে দাও। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠত্বের আত্মাভিমান নিয়ে তার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করা আমাদের উচিত কাজ হচ্ছে না। তাকে কাছে ডেকে নাও। আত্মীয় বলে সমাদর করো। পাণ্ডবেরা যাদবদের সঙ্গে এক হয়ে যাক। শত্রুরা দেখুক তারা আত্মীয় ও বন্ধু।

বলরাম কৃষ্ণের বাক্যে যুগপৎ উৎসাহিত হয়ে ও উৎফুল্ল হয়ে বলল, এ কথাটা অনেক আগেই আমার ভাবা উচিত ছিল। কিছুকাল পরে রৈবতকে উৎসব আছে। তখন অর্জুনের সঙ্গে যাদব পরিবারের অবাধ মেলামেশাটা আরো আন্তরিক হবে। মিলনটা উৎসবের মেজাজ পাবে। অর্জুনেরও মনে হবে না সে আগন্তুক। নিজেকে দ্বারকার একজন বলে ভাববে। ওকে খুশিতে রাখার কাজটা তোমার চেয়ে কে করতে পারে?

কৃষ্ণ বলল, শুনছি, বিশ্রাম নিয়েই ও আবার বনবাসে চলে যাবে।

বলরাম বলল, উঁহু ওসব ভূত ওর মাথা থেকে তাড়াও। নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ, পানভোজনে এমন মজিয়ে রাখো যে ঘোর যেন না কাটে। রৈবতকের উৎসবটা দেখে যাক, এটা আমি চাই।

কী একটা ভেবে কৃষ্ণ বলল, আমি তো ওর সঙ্গে সর্বদাই আছি। দেখে মনে হচ্ছে অর্জুন আর নিজেকে নিজের বশে রাখতে পারছে না।

ও তোমায় খুব ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তুমি চাইলে ওকে দিয়ে অনেক কিছু করে নিতে পার। ওর সম্পর্কে যা শুনছি, তাতে মনের শূন্যতা ভরাতে তোমার সাহায্য খুব দরকার। তোমার আকর্ষণেই সে দ্বারকায় থাকবে।

কিন্তু ভাইয়া পুরুষ মানুষের মনের রিক্ততা একজন পুরুষ বন্ধুর সাহচর্যে কতখানি ভরে ওঠে? ঈপ্সিত নারীই পারে প্রাণের পাগলামি পরিপূর্ণ করতে।

বলরাম কেমন একটা অদ্ভুত বোবা দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বলল, দ্বারকায় তো সুন্দরী রমণীর অভাব নেই।

রৈবতকের উৎসবের এখনও অনেক দেরি। ইত্যবসারে অর্জুনের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনদের পরিচয় ঘটানোর জন্য কৃষ্ণ তাকে নিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করল। স্বর্ণ নির্মিত রথে কৃষ্ণ ও অর্জুন পাশাপাশি বসল। পৃথক রথে সত্যভামা ও সুভদ্রা। জনমানবহীন রাস্তার দু'পাশে পাহাড়, বন, নদী, ঝরনা দেখতে দেখতেই অর্জুন চলছিল। রথের চাকার ঘর ঘর শব্দ অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করছিল। কিন্তু তাতে তার পথিক মনের সুন্দর অনুভূতিগুলো নড়ে চড়ে মনের ওপর চেপে বসল। ভালোবাসা, সুখশান্তি, ঘরসংসার, সুন্দর ছেলেমেয়ে নিয়ে এক আকাঙ্ক্ষিত জীবনের তৃষ্ণা ব্যাকুল করল তাকে। জীবনে নারী পেয়েছে। নারীর প্রেম, ভালোবাসা তাও পেয়েছে। নারীকে সন্তান দিয়েছে তবু স্নেহ মায়া মমতায় বাঁধেনি নিজেকে। এমন কি যে নারী নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তাকে আহ্বান করল, সেই উলুপীও একদিনের অধিক ধরে রাখতে পারেনি তাকে। কেবল যে চিত্রাঙ্গদাকে দেখে শরীর মন আকুল হয়েছিল তারও বন্ধন শিথিল হল। অথচ, এই সময়টায় দ্রৌপদীর কথা একবারও মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছিল তার ওপর একার কোনো দাবি নেই। সে পঞ্চভ্রাতার। তাকে নিজের মনে করে কষ্ট পাওয়ার অর্থ হয় না। উলুপীও তাকে দাবি করেনি। সে শুধু নিজে তৃপ্ত হতে চেয়েছিল। আবার চিত্রাঙ্গদার ওপরেও তার দাবি করার কিছু ছিল না। সে ছিল তার পিতার এবং তার দেশের। এমনকি তাদের প্রেমের কুসুম বভ্রুবাহনও তার নিজের নয়। চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করার শর্তই ছিল পুত্রের ওপর পিতার কোনো দাবি কিংবা অধিকার থাকবে না। বড় অদ্ভুত জীবন তার। একান্ত নিজের বলে এ-জীবনে কাউকে দাবি করা হল না।

নিজের বলে অধিকার দাবি করার মতো যথেষ্ট মাটি তার পায়ের তলায় ছিল না। অনেক কিছু পেয়েও ধরে রাখতে পারল না। শুধুই হেরে গেছে নিজের অনন্ত চাওয়ার কাছে।

অর্জুনকে নীরব দেখে কৃষ্ণ মজা পেল। সকৌতুকে জিগ্যেস করল, সখা তোমার মনের সমুদ্রে এখন জোয়ার, না ভাটা। এত তন্ময় হয়ে কালপ্রবাহের মধ্যে কী দেখছ?

বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। বলল, সখা তুমি তো জানো। দ্রৌপদীর কথা মনে হলে খুব কষ্ট হয়। তার শূন্যতা ভুলতে একটার পর একটা নারীসঙ্গ করেছি। উলুপীর সঙ্গমসুখের প্রার্থনায় তপ্ত যৌবনজ্বালা নিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করেছি, কিন্তু মন বাধা পড়ল না তার কাছে। যে মন দ্রৌপদীকে দিয়েছি তার দোসর খোঁজা অবসান হল চিত্রাঙ্গদার মধ্যে। খুঁজে পেলাম আমার প্রেমকে। তার সান্নিধ্যে আমার জীবন এই প্রথম রঙে রসে আর সুন্দর কল্পনায় রঙিন হল। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম স্ত্রী-পুত্র, সংসার নিয়ে এক চিরন্তন সুখী সংসারের। কিন্তু মণিপুর রাজা মেয়ের ওপর, দৌহিত্রের ওপর তাঁর অধিকার না ছাড়ার জন্য স্বামীর অহংকার, পিতার অহংকার ধাক্কা খেল। ক্ষণিকের জন্য মায়ায় আটক থাকলেও বিরাট পৃথিবীর আকর্ষণে আবার বেরিয়ে পড়লাম। গৃহমুখী সংসার আসক্ত মনটি যে চিত্রাঙ্গদাকে এবং তার পুত্রকে সত্যিই ভালোবেসেছিল মণিপুর ছেড়ে আসার পর তা মনে হল। বৎসরান্তে সেই চিত্রাঙ্গদার কাছে ফিরে এলাম। সুখী সংসারে আসক্ত মনটি পাছে পুত্রের স্নেহ মমতায়, কিংবা স্ত্রীর প্রণয়পাশে বাধা পড়ে, যদি সত্য ভঙ্গ হয় তাই মনকে শক্ত করে প্রিয়তমা চিত্রাঙ্গদার চোখের সমুদ্র বিন্দুতে চোখ রেখে বললাম, আমাকে যেতে হবে। ঈশ্বর তোমায় দেখবেন। আমার ভালোবাসা একদিন তোমাকে ও পুত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। অশান্ত মনকে এভাবে শান্ত করে আবার মুসাফির হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর পিছন ফিরে তাকায়নি। নিজের কাছ থেকে এভাবে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সখা। সারা বুকের মধ্যে মরুভূমির শূন্যতা, রুক্ষতা নিয়ে পথ চলা বড় কষ্টকর। কত তীর্থ, কত মন্দির ঘুরলাম কিন্তু মনের শান্তি পেলাম কৈ? মনে হচ্ছে, একটা বড় কিছু ঘটবে বলে বিধাতা আমায় এখানে টেনে এনেছে।

কৃষ্ণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, সময়ই সবচেয়ে বড় বন্ধু। মনকে সুস্থ রাখার সবচেয়ে বড় বদ্যি। জীবনের সবচেয়ে বড় বড় ক্ষতি তার প্রলেপেই একদিন নিরাময় হয়। তাই হয়তো তোমার মনে হল, এই সেই সাগরতীরবর্তী সেই স্থান যেখানে সব রোগের উপশম হয়। কথাটা বলে একটু মুচকি হাসল।

অর্থপূর্ণ সেই হাসিতে অর্জুন চমকাল। কৃষ্ণ কিছু বলার আগে না জানার ভান করে বলল, আমাদের পশ্চাত পশ্চাত যে রথটি আসছে, সেখানে ভাবী ছাড়াও আরো একজন রমণী শূন্য দৃষ্টি মেলে প্রকৃতি দেখছে। ওঁকে বড় অন্যমনস্ক আর উদাস মনে হচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঐ দৃষ্টির সামনে। ওঁর কৃষ্ণ কাজল গভীর চোখ দুটিকে দেখেছি। চোখ দুটিতে সুদূরের হাতছানি। উনি কে?

কৃষ্ণ সহজভাবে বলল, উনি আমার ভগিনী সুভদ্রা।

সুভদ্রা সম্পর্কে অহেতু কৌতূহল দেখানোর জন্য এক অপরিসীম লজ্জায় তার কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। নিজেকে ধিক্কার দিল। কৃষ্ণ কী ভাবল তাকে। ছিঃ করল নিজেকে। একটা অপরাধবোধে পীড়িত হচ্ছিল। কৃষ্ণ অর্জুনের অবস্থা দেখে বলল, গদ তোমাকে এর কথাই বলেছিল। ভারি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো স্নিগ্ধ, শান্ত, নম্র ব্যক্তিত্বের মেয়ে। ওর সঙ্গে কথা বললেই টের পাবে। না জেনে কৌতূহল দেখানোর জন্য তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এ বয়সে রমণী সম্পর্কে ঔৎসুক্য না থাকা অসুস্থতার লক্ষণ। তুমি কিছু ভেব না। ওকে নিয়ে যদি তোমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগে মনে তাহলে আমার পিতাকে বলতে পারি। চাইলে তুমিও সরাসরি কথা বলতে পার।

ললনাপ্রিয় অর্জুন এবার লোভাতুর চোখে তাকাল কৃষ্ণের দিকে। ক্ষণিক চিত্ত দৌর্বল্যের জন্য সখা তাকে পরিহাস করল কি না বুঝতে চেষ্টা করল। কৃষ্ণ ঈষৎ কৌতুক মেশানো বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, লজ্জা নারীকে মানায়। পুরুষ বীর্যের দম্ভে নারীকে দাবি করবে। বর্ণাঢ্য পোশাকে আর অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, গায়ে বর্ম এঁটে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাল তরোয়াল নিয়ে জিতে নেবে বাঞ্ছিতাকে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রমণী তাকিয়ে থাকবে তার বীরের দিকে। সোহাগভরা হাতের মালা রচনা করে বীরকে পুলকিত হয়ে বলবে, তুমি আমার জ্বলন্ত মশাল। আমি তোমাকে বীরের সম্মান দেব না। আমি দেব প্রেম। সে প্রেমে আনন্দ যত আছে বেদনাও আছে ততো।

অর্জুন চুপ করে শুনল। তাকেই ঠিক করতে হবে চিত্রাঙ্গদাকে ভিক্ষুকের মতো প্রার্থনা করবে, না বীর্যবলে জয় করে রাজবধূ করবে। রথে বসে বসে ভাবছিল, বীর্যহীন রাজদর্প তো অরণ্যে রোদন। কিন্তু যে বীর, সে দয়া, করুণা চায় না। আপন পৌরুষবলে সে দাবি করে, অধিকার করে। সর্বকালের স্মৃতিতে তখনই তার সাহস ও সাফল্য অমর হয়ে থাকে। কৃষ্ণ তাকে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল প্রেমের শক্তি দিয়ে সুভদ্রার প্রেমকে জয় করা যায়। সে হল আকাশের চাঁদ। তাকে-পাওয়া

কি অমনি অমনি হয়। যুদ্ধ না করে তার প্রেম পাওয়া যায় না। তাকে যদি পেতে চাও বীর্যের গর্বে অধিকার করতে হবে তাকে। প্রিয়তম সুভদ্রাকে বধূরূপে পাবে। সখা অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ বীরের কাছে সেই পাওয়াকেই কৃষ্ণ পরমপ্রাপ্তি মনে করে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর অর্জুন কেশর ফোলানো সিংহের মতো বলল, ভুবন আলো করা যে নারীর বুকে প্রিয়তম অমৃত, তাকে হরণ করতে যদি বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করতে হয় অর্জুন তাই করবে।

রথ দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্র চিত্রটা বদলে গেল। রাজপথে বড় বড় তোরণ নির্মিত হয়েছিল। নগরের পথঘাট, গৃহ, বিপণি, পত্র-পুষ্পে ও পতাকায় সুসজ্জিত দেখল। গৃহগুলি বড় যত্নে, আদরে, সোহাগে সাজানো। অপেক্ষমান নর-নারীরা অর্জুনকে দেখামাত্র সোল্লাসে জয়ধ্বনি করল, শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। মেয়েরা উলু দিচ্ছিল। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভাবাবেগে তার লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। আবেগে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে দুলে উঠল অর্জুনের মন। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে সে জনতাকে অভিনন্দিত করল। অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্য হল।

সবই কৃষ্ণের পরামর্শে বলরাম আয়োজন করে রেখেছিল। শুধু বৃষ্ণিরা নয়, সমগ্র যাদবকুল তার সংবর্ধনায় এগিয়ে এল। যার জন্য এতবড় আয়োজন সে কিন্তু বিন্দুবিসর্গ জানত না। যাদবদের মনের মধ্যে কুন্তী পুত্র যে কত গভীর করে আছে অর্জুন তার সংবর্ধনায় প্রথম জানল। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল চিত্ত। যাদবদের বড় আপন মনে হল। প্রেমপ্রীতির এই সম্পর্ক তাদের বহুদিনের। এরকম একটা ভাবাবেগে অর্জুন বেশ কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দিকে স্নিগ্ধ হাওয়া, ফুলের সুগন্ধ, পাতার গন্ধ, মানুষের অব্যক্ত ভালোলাগার কলরব, তাকে বিস্মৃত করল।

অর্জুন কিন্তু এভাবে নিজেকে বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারল না। দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে একবার পিছন ফিরে সুভদ্রার দিকে তাকাল। মুহূর্তে তার মধ্যে কী যেন সব ঘটে গেল। চোখে পলক পড়ে না। বুকের গভীরে নূপুর বাজছিল। সুভদ্রার চোখেও কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা। তাতেই অর্জুনের ভেতরটা আকাশজোড়া বিদ্যুতের মতো চমকিত হতে লাগল। তাহলে সুভদ্রার মনও কি আকুল হয়েছে তার জন্য? চোখে চোখ পড়তে বিব্রত লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল সুভদ্রা। সেই মুহূর্তে অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল প্রেমের কল্লোল নিয়ে সুভদ্রার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। মনে মনে বলল, ওগো সুন্দরী তোমার মতো আমারও বুকে বড় কষ্ট গো।

সে রাতে ঘুম এল না অর্জুনের। চোখ বন্ধ করলে সুভদ্রাকে দেখতে পায়। তার যৌবন দীপ্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা পদ্মকলির মতো মুখ, স্বপ্নালু আঁখি, লাবণ্যময় সারা অঙ্গে অলঙ্কারের দীপ্তি, তার দেহমনে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করল। এক ধরনের অপ্রকাশ্য আনন্দের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনায় তার জ্বর জ্বর লাগছিল।

কয়েকদিন ধরে একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটাল অর্জুন। নিজেকে তার লুকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। তার মুখ চোখই বলছিল, সে ভালো নেই। কৃষ্ণ তার মনের অবস্থা বুঝেও কিছু বলেনি। হঠাৎ একদিন প্রাতরাশ করতে করতে বলল, তোমার কী হয়েছে বল তো? সব সময় অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছ? তোমার সেই উৎফুল্ল ভাবটা একেবারে নেই। দিন দিন মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখে কালি পড়ছে। মনে সুখ আনন্দ না থাকলে এমন হয়। এমন কী ঘটল যে দ্বারকায় আসা থেকেই বদলে গেছ। তবে কি মনটা চুরি হয়ে গেল? উঁহু লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অসংকোচে আমাকে বলতে পার। আমি বন্ধু তোমার।

কৃষ্ণের এরকম প্রশ্নে অর্জুন একটু বিব্রত বোধ করল। সংশয়ভরা দু'চোখ মেলে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলল, মন সত্যি চুরি হয়ে গেছে। বামাল সমেত মালিকের কাছে ধরাও পড়ে গেছি। কিন্তু কিছু করার নেই।

তোমার মন চুরি যাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে বল?

জানি না। যা করলে আমার কষ্ট দূর হয়, তোমার বংশের সম্মান রক্ষা হয়, তাই কর।

আরো কিছুদিন অপেক্ষা করো। আমার ভগিনীকে এখনও বোঝা হয়নি। তুমিও প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়েছ, না চোখের নেশায় প্রিয় হয়েছে সে;— এটা বুঝতে আমারও একটু সময় চাই।

যাদবেরা ফুর্তিবাজ লোক। কথায় কথায় অনুষ্ঠান লেগেই থাকে তাদের। ছেলে বুড়ো সব একজায়গায় একত্র হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে একটু আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হুল্লোড় করে। তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চেনা চিনি ও জানাজানি হয়। সম্পর্কটাও নিবিড় হয়। তাই অচেনা অর্জুনের আগমন উপলক্ষে তেমনি একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করল বলরাম। এটা একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান। রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত সব ব্যক্তিরাই মিলিত হওয়ার জন্য এল। এদের দেখভাল করছিল সুভদ্রা। দায়িত্বটা কৃষ্ণই দিয়েছিল তাকে, সুভদ্রার অনাবিষ্কৃত মনটাকে হয়তো সে নিজেই ভালো করে জানে না, সুভদ্রা সে কথা মানতে চায়নি বলে তাকে বোঝানোর জন্য কৃষ্ণ বলল, যেমন এক আকাশে কখনো মেঘ হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, রোদ হয়, তা

বলে কি আকাশ শুধু মেঘ, বিদ্যুৎ আর রোদের? সে কি নীল নয়? তার গায়ে হালকা সুন্দর তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘ কি ভেসে বেড়ায় না? তার কালো আকাশে কত তারা, কত জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ। এসব নিয়ে ভোরের আকাশ, দুপুরের আকাশ, বিকেলের আকাশ। প্রত্যেক আকাশে রূপ, রঙ, আকৃতি ভিন্ন। তেমনি বিবিধ পরিবেশে, বিবিধ অবস্থায় মানুষের মনেরও বিভিন্ন রকম অবস্থা হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও পারে না এই অবুঝ মনটি নিয়ে স্পর্ধা করতে।

সমাবেশের মধ্যে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর সময় সুভদ্রা বেশ বুঝতে পারছিল তার লুব্ধ দুটি চোখ অর্জুনকে দেখার জন্য উৎসুক হয়েছিল। মনকে শাসন করলে কি হবে, মন তো দেহের মধ্যেই থাকে। শরীর, মনে প্রবিষ্ট হয়ে তার সমস্ত সত্তাকে উন্মুখ করে তুলেছে। কেন করেছে জানে না। কিন্তু এক উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা তাকে কিছুতে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কচি বয়সের ধর্মই হল কৌতূহলিত করা। সেই কৌতূহলবশেই সুভদ্রা আড়চোখে অর্জুনকে দেখল। মুগ্ধ আঁখিজোড়া মেলে দেখল অর্জুনের বর্ণাঢ্য পোশাক, তার ঝকঝকে অলঙ্কারে শোভিত রাজবেশ, মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার, হাতে ধনু, পিঠে তূণ। দিগ্বিজয় করে বীর যেন ফিরে এল ঘরে। সুভদ্রার হঠাৎই মনে হল, স্বপ্নের বীর এসেছে তার মতন এক সামান্যা নারীর কাছে প্রেম পেতে। কথাটা মনে হতেই সারা গায়ে কাঁটা দিল। এক অদ্ভুত লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। সুভদ্রার খুব আশ্চর্য লাগল হঠাৎ এরকম ভাবাবেগ হল কেন তার? এই অনুভূতির উৎস কোথায়—তাও জানা নেই তার। স্থান কাল ভুলে এক আশ্চর্য ভালোলাগা নিয়ে চোরাচোখে অর্জুনের দিকে তাকাল। অর্জুনও কি অনুরূপ উপায়ে দেখছে তাকে? দেখার নেশায় পেয়েছিল সুভদ্রার। তাই বেশ কিছু লোকজনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অর্জুনকে বারবার দেখছিল।

অবাধ্য মনকে শাসন করার জন্য বলল, এই দুর্বলতা তাকে মানায় না। কিন্তু এ হল তার কচি বয়সের ধর্ম। শাসন করতে গেলে বয়স শুনবে কেন? বয়সের তো মোহ আছে, লোভ আছে, স্বপ্ন আছে, সাধ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। এক এক বয়সের এক এক ধর্ম। এই কথাটা বোঝাতেই হয়তো কৃষ্ণ বলেছিল, এক আকাশ, তবু কত তার নাম। কত রকম তার আকৃতি, কত রূপ রঙের বাহার সেখানে। মানুষের মনেরও বিভিন্নরকম অবস্থা হয়। এটা দোষের নয়, লজ্জা পাওয়ারও কথা নয়। এ হল জীবনের ধর্ম। সুভদ্রা এই প্রথম জানল হৃদয়ের মতো এত বড় অনাবিষ্কৃত দেশ আর নেই। কৃষ্ণ ঠিকই বলেছিল এখানে কোনো জিনিস একদিনে জানা শেষ হয় না। প্রতিটি মুহূর্ত এখানে নতুন। যার দুর্বার আকর্ষণ সুভদ্রা কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারল না।

সুভদ্রার অনুসন্ধানী মনটা চিরে চিরে নিজেকে দেখল। বেশ বুঝতে পারছিল, অর্জুন নামের বহু প্রচারের ভেতর কোথায় যেন একটা মোহ ছিল। যার দুর্বার আকর্ষণ সে কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

দ্বারকাবাসীর সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় করে দেবার একটা উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে গণমুখ্যদের সঙ্গে অর্জুনও বসেছিল। কৃষ্ণ বলরামও ছিল তার পাশে। বিবিধ মানুষের কথাবার্তা, হাসি, উচ্ছ্বাসের কোলাহলের মধ্যে সবকিছু চাপা পড়ে গেল। কারো কথা ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দুন্দুভির আওয়াজ হতে সমাবেশ শান্ত হল। অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণ মঞ্চের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। করজোড় করে সকলের সামনে দাঁড়াল অর্জুন। সমাবেশে আগত আত্মীয়বর্গকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বলল, আজ এক হারিয়ে যাওয়া চাঁদকে আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়েছি। অর্জুন আমার প্রিয় সখা। কিন্তু আমাদের পরম আত্মীয়। অর্জুন হল পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র। সে একজন বলবীর্য সম্পন্ন ব্যক্তি। তার সমকক্ষ ধনুর্ধর একজনও নেই। তাই লোকে ধনঞ্জয় বলে তাকে। যুদ্ধের সময় দু'হাতে সমান অস্ত্র চালাতে পারে বলে লোকে তাকে সব্যসাচী বলে। বীর্যের সঙ্গে মেধা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যুক্ত হওয়ায় জন্য একজন অসাধারণ রাজনৈতিক পুরুষরূপে তিনি বন্দিত হন। যাই হোক, দেরিতে হলেও ঘরের ছেলেকে আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়েছি। তার খ্যাতি ও গৌরবে আপনারাও গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

অর্জুনের অধরে গর্বিত হাসি। সমবেত মানুষের চোখ দুটি তার ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু অর্জুনের উৎসুক দুটি চোখ যেন কাকে খুঁজছিল। সে চোখ দুটো অনুরাগের আভাসে কেমন গভীর আর স্নিগ্ধ। অর্জুনের মায়াবী দুই আঁখি তারকার দিকে তাকিয়ে গোপবালারা দিশাহারা। প্রত্যেকেই ভাবছিল অর্জুন বুঝি তাকেই কামনা করছে। নিজেদের অজান্তে তাদের বিভোল দুটি চোখ অর্জুনের চোখে এমন করে মেলে ধরল যেন চোখের দৃষ্টি একটুও তার চোখের বাইরে উপচে না যায়। এমন সুন্দর কন্দর্পকান্তি দেবতার মতো দেখতে পুরুষকে কোন মেয়ের না স্বামী করতে ইচ্ছে হয়। অনুরাগের আভাসে তাদের চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। কিন্তু অর্জুন এদের কাউকে নয়, ওদের মধ্যেই সে সুভদ্রাকে খুঁজছিল। আর কেউ না জানলেও সত্যভামা জানে।

সত্যভামার পাশে সুভদ্রা মুখ গোঁজ করে বসেছিল। পাছে অর্জুন দেখে ফেলে, কিংবা অবাধ্য দুটি চোখ নির্লজ্জের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাই মাথা হেঁট করে চোখ ঢেকে বসেছিল। সত্যভামা হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, জালে জড়িয়ে পড়া হরিণীর মতোই যে ছটফট করছিস, নিজেও জানো, তবু লজ্জা কাটিয়ে সহজ হতে পারছ না। সত্যি, তুমি যেন কী ঠাকুরঝি?

সুভদ্রা তবু মাথা তুলে অর্জুনকে দেখল না। সত্যভামা বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, পাগলামি কোরো না। কাঙালের মতো নয়, একজন বীরের মতো সে তোমাকে প্রার্থনা করছে। তার একটু করুণা পেলে মেয়েরা যেখানে ধন্য হয়ে যায়, তাকে অবহেলা করে তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ শুধু।

সুভদ্রা লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমি কী করব? আমি কি মালিক? তোমরা, দাদারা, বাবা এবং মা মিলে যা ঠিক করবে আমাকে তো তাই করতে হবে।

তবু তোমার ব্যাপারে শেষকথা বলবে তুমি। তোমাকেই স্থির করতে হবে কী করবে। কারণ ঘর করবে তুমি।

সত্যি বলতে কি অর্জুনের কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে আর ভণ্ডামি ভালো করে বুঝি না। সেজন্যই ভয় হয়। অর্জুন সম্পর্কে এত জেনেছি যে, ওসব কথা মাথায় রেখে এক অচেনা মানুষের সঙ্গে এক অচেনা মাটিতে পা রাখতে সত্যি ভয় করছে। শাশুড়ীর হাতে দ্রৌপদী যেভাবে হেনস্তা হয়েছে তাতে আমার ভয় পাওয়ারই কথা। আমার জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এসব ভাবনা-চিন্তা তো আগে ছিল না। অর্জুন আমাদের মধ্যে আসা থেকেই এসব চিন্তা মাথায় ঢুকছে। নিজের মনের আবরণ খুলে নিজেকে দেখছি। এই দেখা শুধু শুরু। বিশ্বাস করো, নিজের মনের মধ্যে যে কতরকমের ভয়, সংশয়, অবিশ্বাস, উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনা নিয়ে রাত পোহায় আমি ছাড়া এই পুরীর আর কেউ জানে না। ভাবী, বড় ভয়ে ভয়ে থাকি।

সত্যভামা থমথমে গলায় বলল, এটা হল সব মেয়ের একটা রোগ। একদিন আমিও সংশয়ে ভুগেছি। চেনা জায়গা ছেড়ে একটা অচেনা জায়গায় অচেনা মানুষের মধ্যে এলে এরকম দুর্ভাবনা হওয়া কোনো অন্যায় নয়। তবে, এর বেশ কিছুটা মনগড়া কাল্পনিক ভয়। এই ভয়ে ভুগে মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দেওয়া। সবটাই মেয়েদের কপাল। অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা তো হবেই। দ্রৌপদী রূপবাণ, বীর্যবান, স্বামী পেল। তার বুকে ভালোবাসার সাগর। তবু দ্রৌপদীর অদৃষ্ট কেড়ে নিল তার সেই সৌভাগ্য। এখানে অর্জুনের কী দোষ? তার ভাগ্যে যা লেখা ছিল তাই হল। দ্রৌপদী যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করল সেও তার ভাগ্যলিপি। ভাগ্যকে মেনে নিতে হয় সকলকে। তুমিও ভাগ্যের সুতোয় বাঁধা। কারণ ভাগ্যকে তো আর দেখা যায় না। তাই বোধ হয় ভাগ্যের কথা ভেবেই সব মানুষের এক অঘোষিত সংগ্রাম শুরু হয় নিজের সঙ্গে।

ভাবী, তুমি যা বললে তা হয়তো সত্য। কিন্তু আমি এভাবে ভাবিনি। আমার

মনে অর্জুনকে ভালোলাগার এই সুরের তরঙ্গ কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমি তা অনুভব করার চেষ্টা করেছি। তার কথা শোনার জন্য কান পেতে আছি। কিন্তু তার প্রতি কোনো টান অনুভব করছি না। কিংবা মনেও কোনো দাগ কাটছে না। বিশ্বাস করো, চোখের ভালোবাসা মনের ভালোবাসা হয়ে ওঠেনি। আজ আমার মধ্যে যে চিত্ত চাঞ্চল্য তুমি প্রত্যক্ষ করলে তা বাইরের ঢেউ। বয়সের ধর্ম চুম্বকের মতো অর্জুনের দিকে টানছে। কিন্তু সেই চোখের নেশাকে প্রেমে পড়া বলে না। ওটা বয়সের খিদে। সেকারণে তার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলার বিলাসিতা করার কোনো উৎসাহ বোধ করছি না। উলুপীর তীব্র ভালোবাসাকে ব্রহ্মচারী অর্জুন সংযমের বাঁধ দিয়ে প্রতিরোধ করেনি। বরং তাকে দেখামাত্র অফুরন্ত যৌবনের ছন্দে ও ভাষায় উলুপীর সঙ্গে সঙ্গম করেছে। সংযম ভঙ্গের জন্য শপথ ভঙ্গের জন্য একবারও নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি। দ্রৌপদীর কথা ভেবে মৃদু আপত্তিও করেনি। সঙ্গম সুখের উল্লাস উত্তেজনার স্রোতে না ভাসিয়ে দিলে এটাও শুধুই অর্জুনের শরীরের ব্যাপার ছিল। মনের কিছু নয়। তাই এক রাতেই নেশা কেটে গেল। কামাচারী লম্পট পুরুষের মতো তাকে ত্যাগ করে যেতে একটুও বিবেকে বাধেনি। সেজন্য তার মনে পাপ, অনুশোচনাও ছিল না। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা করতে যদি না পারি তাহলে দোষ দিও না।

তোমার কী হয়েছে বলো তো?

কী আর হবে। নিজের মূল্য যদি নিজের মধ্যে একান্ত সত্য করে অনুভব না করি, স্বীকার না করি তাহলে এই চোখের নেশার পরিণতি যে একদিন দুর্গতির কারণ হবে না কে বলতে পারে। ভাবী, যে নারী নিজের মূল্য বোঝে না, সংসারে কানাকড়ি দাম সে পায় না। স্রোতের শ্যাওলা হয়ে সংসার সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হয় তাকে। এসব ভেবে না চললে কোনো নারীই পুরুষের কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে না।

বিস্ময়ে সত্যভামার দু'চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। মুগ্ধ হয়ে বলল, জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে এসব কথা ভাবার আছে। কিন্তু বেশিরভাগ মেয়েকে সেই ভাবনাটা করতে দেওয়া হয় না। তার সুযোগও সে পায় না। কারণ তার মালিক সে নিজে নয়। তাই অধিকারের সীমাটুকু তার জানা নেই। তোর মতো এত অধিকার সচেতন আমিও হতে পারিনি। নতুন কথা শুনে বুকটা আমার আনন্দে ভরে গেল। সত্যিই তো যেখানে শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই সেখানে ভালোবাসার কোনো ঠাঁই নেই।

ভাবী, আত্মমর্যাদা ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস নয়। নারীকে মর্যাদা আদায়ের জমি নিঃশব্দে তৈরি করতে হয়। আমার এই বিশ্বাসের মধ্যে অনন্তকালের প্রেয়সীটি তার নারীত্বের দাবি, অধিকার নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকারের প্রেম ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায়। বিভ্রান্ত করা তার ধর্ম নয়। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই। তাই অর্জুনকে আমার জীবনসঙ্গী বলে নির্বাচন করতে পারছি না।

অথচ, অর্জুনের মতো রূপবান, বীর্যবান, খ্যাতিমান পুরুষ সব নারীর কাম্য। কেবল তুই সকলের থেকে একেবারে আলাদা। তার মতো রাজপুত্রের সুন্দরীর অনেক স্ত্রী থাকতে পারে। দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী, বিদুষী, সমাজে প্রশংসিত স্ত্রীও আছে। কিন্তু তার ওপর অর্জুনের একার দাবি নয়। স্ত্রীর কোনো দাবিই সে পূরণ করতে পারেনি। দ্রৌপদীও তৃপ্ত করতে পারেনি তার স্বামীর অহংকার। উলুপীর সঙ্গে এক রাতের সম্পর্কে যেটুকু পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে তার স্মৃতি নিয়ে একটানা দীর্ঘপথ চলা সব পুরুষের পক্ষে কষ্টকর।

কিন্তু উলুপী তো জানল, অর্জুন তার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করেছে। উলুপী তো ভালোবেসেই স্বামীরূপে বরণ করেছিল। উপজাতি মেয়ে সে। ভেবেছিল এই বিশ্বাসই প্রেমের অভিজ্ঞান হয়ে থাকবে। প্রেম, ভালোবাসা তার কাছে কোনো মেকী ব্যাপার নয়। তার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকতে পারে না। এরকম গন্ধর্ব বিবাহ তো অসংখ্য হয়। শ্রদ্ধা ও পবিত্র বিশ্বাসই তাদের নিটোল প্রেমের বন্ধন হয়ে থাকে। কিন্তু অর্জুনকে যে রাত পোহালে আঁকড়ে রাখা যাবে না এটা ভাবেনি। অর্জুনের দয়া, করুণা, অনুগ্রহ সে ভিক্ষে করল না। একজন ভণ্ড, ভীরু, কাপুরুষ, পলাতকের কাছে কি বা প্রত্যাশা করতে পারে। তাই, অর্জুনকে ফেরানোর কোনো চেষ্টা করল না। বরং, যে মুক্তি পেতে চায় তাকে মুক্ত করে দিতেই সে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। অথচ এই মেয়েটি যখন মা হল, একবারও মনে হয়নি তার পায়ের তলায় মাটি নেই। মাথার ওপর ছাদ নেই। নিজেকে নিরাশ্রয় অনাথ কিংবা অবলম্বনহীন ভেবে একটু মাথাও নোয়ায়নি। উলুপীর কাছ থেকে নারীর এই আত্ম-স্বাতন্ত্রবোধ শিক্ষণীয়। নারীর এই সম্মান, মর্যাদা উলুপীর মতোই নিজেকে আদায় করে নিতে না জানলে তাকে দুর্ভোগে পড়তে হয়।

বিধাতা হয়তো এরকমই চেয়েছিলেন। উলুপীর নিজের দোষেই এমনটা ঘটল।

উলুপী বিশ্বাস করেছিল। হৃদয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রেমের দেবতাকে ভোগ দিয়েছে। তাই কোনো পাপ, অনুশোচনা ছিল না। নিজেকে কখনও অশুচি মনে হয়নি। বরং এক অনাস্বাদিত পবিত্রতায় মন ভরে ছিল বলে সে আর কোনো পুরুষ বরণের কথা ভাবেনি। নিজেও বোঝা হয়নি অর্জুনের জীবনে।

সত্যভামা বলল, মানছি। উলুপীকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি বলে তার ওপর তোমার রাগ হয়। কিন্তু মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন ভালোবেসেছিল। চিত্রাঙ্গদা পারেনি প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বামীর অনুগমন করতে। দেশের টান, প্রথার আকর্ষণ স্বামীর থেকেও বড় ছিল তার কাছে। তবু অর্জুন পুনর্বার তাকে দেখার জন্য মণিপুরে ফিরে এল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তার সঙ্গে যেতে চাইল না বলে অর্জুনের পুরুষত্বের অহংকার তার অধিকার চেতনায় একটা বড় আঘাত লাগল। চিত্রাঙ্গদার প্রত্যাখ্যানের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া কি খুব অন্যায় মনে হয়?

ভিড়ের ঝামেলা এড়াতে সভা শেষ হওয়ার আগে ওরা দু'জন রথে চেপে প্রাসাদের দিকে রওনা হল। দু'জনেই চুপচাপ। স্নিগ্ধ বাতাসে সুভদ্রাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাল। বলল, আমার বুকের ভেতর সমস্ত স্ফুলিঙ্গের ওপর ঠান্ডা বাতাস লেগে সব জুড়িয়ে যাচ্ছে যেন। ভাবী, আমার কথায় যদি ব্যথা পাও তাহলে ক্ষমা করে দিও। গোঁজামিল দিয়ে কোনো একটা সমস্যাকে চাপা দিয়ে আপাতভাবে মেটানো যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী সমাধান হয় না। সেটা বোঝানোর জন্য তোমার সঙ্গে তর্ক করলাম। আমি জানি, ভাইয়া ভীষণভাবে চায় অর্জুনকে বিয়ে করি। কিন্তু আমারও যে খুব অনিচ্ছা তা নয়, তবে তার সম্পর্কে আমার মনেতে যে বিরূপ ধারণাগুলো জমেছে অহরহ আমাকে তা পীড়িত করে। স্বামীর আসনে তাকে বসাতে আমার শিক্ষা ও রুচিতে বাধে।

সত্যভামা ওর মুখের দিকে তাকাল। তার সন্ধানী দুটি চোখ কী যেন খুঁজল। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। সুভদ্রার চোখের মধ্যে সত্যভামা এমন করে চোখ দুটি মেলে ধরেছিল যে, সে ছটফটিয়ে উঠল। বলল, অমন করে কী দেখছ?

তোকে। তোর মনকে। তোর ভালোবাসাকে। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী নিজের ভালোবাসার কথা এমন করে লুকোয় না। মন দেয়া নেওয়ার খেলায় নঙর্থক কথাবার্তার একটা ভূমিকা আছে।

সুভদ্রা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, ভাবী আমার প্রেম আমার নিজের। এর কোনো ভাগীদার চাই না। অর্জুন বহুবল্লভা। ললনাপ্রিয় অর্জুনের কাছে নারী হল খেলনা। খেলনা পুরনো হয়ে গেলে আর এক নতুন নারী খুঁজবে। আজ যাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল মনে করছে, কাল যখন অন্য এক রমণীকে চোখে ধরবে তখন তার দিকে ধেয়ে যাবে। যেমন আমাকে পাওয়ার জন্য চিত্রাঙ্গদাকে ভুলেছে।

সত্যভামা মাথা নাড়ল। বলল, চিত্রাঙ্গদাকে পেয়েও অর্জুনের স্বামীজনোচিত অহংকার একটুও তৃপ্ত হল না। সব স্বামীই চায় স্ত্রীর ওপর তার পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীকে তার সাম্রাজ্য মনে করে। কিন্তু মণিপুর-রাজ অপুত্রক ছিলেন বলে কন্যার ওপর তাঁর অধিকার ছাড়তে রাজি নন। তাকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে। অর্জুনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বীর্যবান পুরুষ তাঁর শর্তে রাজি হবে কেন? তাই চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে আসতে হল। এ তো ভালোই হল। তোমার প্রেমের আর কোনো ভাগিদার রইল না। দ্রৌপদী তোমাদের উভয়ের মধ্যবর্তী হয়ে রইল। কিন্তু দীর্ঘ অদর্শনের পরে তার প্রতি অর্জুনের প্রেম তলানিতে ঠেকেছে। তা-ছাড়া আরো স্বামী আছে তার। সুতরাং দ্রৌপদী তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না।

তোমরা সত্যি কী চাও বলো তো? মস্তক ধোলাই করার জন্য যা যা করা উচিত তুমি সারাক্ষণ ধরে তাই করলে। আমার মন বদলের জন্য সত্যিই এসব করার খুব দরকার ছিলো কী?

আমি যা করলাম, তোমার জন্য একথা বলব না। যা করেছি এ রাজ্যের হিতের কথা ভেবেই করেছি। অর্জুনের মতো বীরকে যাদবদের খুব প্রয়োজন। গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী দেশ ও জাতির কথা ভেবে বহুপত্নীক অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামীরূপে বরণ করেছিল। এহ বাহ্য। বিধির বন্ধনই সব। অর্জুনের পত্নী হওয়া যদি তোমার বিধিলিপি হয়, তাহলে তুমি না চাইলেও অর্জুনের গৃহিণী হবে। তখনই অনুভব করবে তোমার সব আচরণের ভেতর অর্জুনের প্রতি কোথায় যেন একটা মোহ ছিল। যার দুর্বার আকর্ষণকে ভুলে থাকার জন্য মিথ্যেই নিজের সঙ্গে ছলনা করছ।

ফ্যাল ফ্যাল করে সুভদ্রা সত্যভামার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, ভবিতব্য যদি তাই হয়, আমি নিরুপায়। ভাগ্যকে যদি মেনে নেওয়ার ব্যাপার হয়, তাহলে আমার প্রেম ধ্রুবতারা হয়ে পথ দেখাবে।

এই বিশ্বাসটুকুই জীবনের সব। একটা পূর্ণতার দিকে পৌঁছতে প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ করে মেয়েদের অনেক অগ্নিপরীক্ষার আগ্নেয়গিরির গা ঘেঁষে এসে মানসগঙ্গায় পৌঁছতে হয়। জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে এসবের হয়তো একটা মানে আছে। এই মানেটাকে চোখ কান খোলা রেখে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না বলে অকারণে দুঃখ ভোগ করি।

প্রাসাদে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশের তারাগুলো এক এক করে ফুটে উঠল। তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘ নীল আকাশে গা ভাসিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস উদ্যান থেকে ফুলের সুবাস বয়ে আনল। কুলায় প্রত্যাগত পাখিরা গাছের শাখায় বসে সঙ্গী পাখিটিকে পাগলের মতো ডাকছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার গভীর হতে রূপসী সন্ধ্যা রাতের সাজে সাজল। এরকম একটা পরিবেশের

মধ্যে সুভদ্রা রথ থেকে নামল। সত্যভামার দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। তারপর একটা অদ্ভুত মুগ্ধতা নিয়ে নিজের কক্ষের দিকে হেঁটে গেল।

মেয়েমানুষের করার কিছু থাকে না। শুধু ভাবনা থাকে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সুভদ্রা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হল। হয়তো তার কোনো যুক্তিই কেউ মানবে না। জোর খাটিয়ে তার ইচ্ছের ধার না ধেরে হয়তো অর্জুনের হাতে তুলে দেবে। নয়তো রাবণের মতো ভিখারি সেজে দয়া, করুণা, কৃপার জন্য হাত মেলে ধরবে তার দিকে। নিজের ভেতর যে নিষেধের গণ্ডিটা আছে তা ডিঙিয়ে যখন কিছু করবে না তখনই তার ভেতর থেকে রাক্ষসটা বেরিয়ে এসে গায়ের জোরে হরণ করবে তাকে। তারপর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো দেয়াল থাকবে না। অশোকবনে বন্দী সীতার মতো মেয়ে হওয়ার জন্য সারাজীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ যদি অদৃষ্টের লিখন হয় তাহলে কি বা করতে পারে? সত্যিই তো, বিধিলিপি কে কবে অস্বীকার করতে পেরেছে?

সত্যভামার কথাগুলো অর্জুন সম্পর্কে তার মনোভাবকে এলোমেলো করে দিল। নিজের কাছেই তার জিজ্ঞাসা ছিল—প্রবল অর্জুন বিরোধিতা কি অনুরক্তির সুপ্ত প্রকাশ? অর্জুনকে তীব্রভাবে চায় বলেই কী দুরন্ত অভিমানে প্রেমিকা রমণীর মতো তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? অর্জুনের বহুপত্নী থাকার জন্য তার একার স্ত্রীত্বের আধিপত্যের অহংকার তৃপ্ত হবে না মনে করে কী তাকে দূরে রাখার জেহাদ এটা? তার মনের তীব্র ভালোবাসা দিয়ে প্রিয় বীরকে যেভাবে পেতে চায় দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা, উলুপীর জন্য কোনোদিন সেভাবে একান্ত করে তাকে পাওয়া হবে না। ললনাপ্রিয় হওয়ার জন্য অর্জুনের প্রতি যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল তীর্যক প্রেমের রন্ধ্রপথ ধরে তা কি অন্য এক মানবীতে রূপান্তরিত করছিল। এখন মনে হচ্ছে, মনের কতকগুলো অপছন্দ দিয়ে সে অর্জুনকে সাজিয়ে ছিল কিন্তু তার মনের চাওয়াকে যাচাই করে দেখা হয়নি। এই কথাটা এখন বেশি করে ভাবতে লাগল। এবার নিজের বাসনার কাছে নিজের মনকে নিরাবরণ করে সে নিজেকে একবার দেখবে। কথাটা মনে হতেই কল্পনায় দেখতে পেল অর্জুনের পদচিহ্ন পড়েছে তার বুকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে তার গায়ের মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে। তার সমস্ত অনুভূতিতে অর্জুন যেন শীতের কুয়াশার মতো লেগে আছে।

সুভদ্রার খুব আশ্চর্য লাগল। যে মনটা অর্জুনের প্রতি বিরূপ ছিল, সেখানে হঠাৎ একটা উল্টো স্রোত বইতে লাগল। তার পালেও লেগে ছিল উল্টো হাওয়া। অর্জুনের উপর বিরূপতার বিষ উগরে দেওয়ার জন্য তার অনুশোচনা হল। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। শুয়ে শুয়ে নিজের মনেই বলল, তার

এই নির্বুদ্ধিতার শেষ কোথায় সে একবার দেখবে। অপলক বিস্ময়ে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে দেখছিল, শোবার ঘর, ঘরের চাল, দেয়াল, মেজে, সব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। বাইরের নীল আকাশে আকাশভরা নক্ষত্র যেন দেবতার লক্ষ লক্ষ চক্ষু হয়ে জ্বলছিল। আর সে গভীর এক অনাস্বাদিত সুখের আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তাই কি ভেতরে এত অধীরতা?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সুভদ্রা দেখতে পাচ্ছিল কৃষ্ণ সমাগত মানুষের সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য বলছিল, অর্জুন এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক নেতা। তার কোনো বিকল্প নেই। তার বুকে অনন্ত ভালোবাসা। দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে সে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ জয় করেছে, বিনা রক্তপাতে সে দেশের রাজা থেকে নাগরিকের চিত্ত জয় করে প্রমাণ করেছে, সাম্রাজ্য বিজয়ে প্রেম, ভালোবাসাই শেষ কথা। হৃদয়ের রাজপথ ধরে বিখ্যাত রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। সহস্র যুদ্ধ, অজস্র লোকক্ষয়ে যা করতে পারে না, অর্জুন বিনা যুদ্ধে একা তাই করেছে। তার সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য আমরাও গর্ব অনুভব করি। যাদবদের রক্ত যেহেতু তার ধমনীতে, তাই এই সাফল্যের গৌরবের আমরাও অংশীদার।

গোটা দ্বারকাবাসী অর্জুনের প্রতি সহানুভূতিশীল হল তার ফলে। কেবল তার সঙ্গে অর্জুনের যত ঝগড়া। অথচ, তার প্রতি অর্জুনের গভীর প্রেম। তার প্রতীক্ষায় আছে সে। তার একটু অনুগ্রহ, কৃপা, করুণা পেলে সে বর্তে যায়। একজন বীর্যবান পুরুষের কাছে তার মূল্য যে এত বেশি দ্বারকাতে অর্জুন না এলে জানা হত না। এই উন্মুখ আগ্রহটা তারই থাকার কথা ছিল, কিন্তু হয়ে গেল উলটোটা। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখল এক গর্বিত হাসিতে তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

চার

স্বর্ণরথে করে অর্জুন ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকা পুরীতে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন পশ্চিম আকাশ লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য পাটে বসছে। নীল আকাশের বুকে বকের সারি মালা হয়ে উড়ে যাচ্ছে অনন্তের অভিমুখে। গাছের ডালে সহজ পাতার আড়ালে পাখিরা নড়ে চড়ে বসতে শুরু করেছে। সারাদিনের পরে একসঙ্গে এক জায়গায় মিলিত হওয়ার হর্ষেই যেন কিচিরমিচির করছে তারা। ধূসর রঙের ভুতুম পেঁচা গোল গোল চোখে একবার মাথা উঁচিয়ে দেখে নিল, বিষণ্ণ বিকেল আঁধারে কৃষ্ণবর্ণ হতে আর কত বাকি আছে।

এ রকম একটা স্নিগ্ধ ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে যেতে যেতে অর্জুনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। ভেতরে ভেতরে এক অদ্ভুত অকারণ বিষণ্ণতা ঢেউ দিয়ে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল, জীবনে এইরকম একটা যতির প্রয়োজন আছে। নইলে নিজেকে সম্পূর্ণ করে চেনা হয় না। দ্রৌপদীকে এ জীবনে পেয়েও তার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হল। স্বেচ্ছা-নির্বাসনে দ্রৌপদীর আসঙ্গ লিপ্সায় মনটা যখন ব্যাকুল সে মুহূর্তে উলুপী তার যৌবন সম্ভার নিয়ে পূর্ণ করেছিল নারী সঙ্গলাভের অতৃপ্তি। কিন্তু জীবনের সুদীর্ঘ পথে একজন পুরুষমানুষের পক্ষে একা একা চলা বড় কষ্টকর। নারীসঙ্গ ছাড়া জীবনের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা কিংবা শূন্যতা পূরণ হয় না। পুরুষের কর্মজগতে সে নারী হবে সিংহিনীর মতো। চিত্রাঙ্গদা হল সেই সিংহিনী। রাজকার্যে, যুদ্ধে, রাজনীতিতে সে যেমন পারদর্শিনী তেমনি কূটবুদ্ধিও তার অধিগত। দ্রৌপদী ভালো প্রেয়সী, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা একজন ভালো বন্ধু, ভালো পার্শ্বসহচর। সর্বার্থে কর্ম সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্য। এদের সবাইকে নিয়ে অর্জুনের দাম্পত্য জীবন। এক একজন এক একটা দিক পূর্ণ করেছে, কিন্তু এখনও মনের শূন্যতা পূর্ণ হয়নি। সেখানটা আদিগন্ত একটা সবুজ প্রান্তরের মতো শূন্য। ভেতরে ভেতরে সে কাঁদে। সে কান্নার উৎস কোথায় জানে না। মণিপুর থেকে বিদায় নিয়েও মনের টানে আবার ছুটে গেল সেখানে।

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল, মুগ্ধতা নিয়ে চিত্রাঙ্গদা তাকিয়ে আছে তার দিকে। বলল, দমবন্ধ বোবা কষ্টের পাষাণভার নিয়ে আমার কাছে ছুটে এলে কেন? আমি তো কোনো কাজে লাগব না তোমার। তুমি তো থেকে যাওয়ার জন্য ফিরে আসনি মণিপুর?

রানী আমার ভেতর যে মানুষটা তোমার জন্য কাঁদে, সেই মানুষটার জন্য তোমার করুণা হয় না? আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি আমাকে বুঝতে চাইছ না। কোনো শর্তভঙ্গ না করেই আমি শুধু তোমাকে চাইছি। মণিপুর রাজ চিত্রবাহনের কাছে আমার সব প্রতিজ্ঞা তোমার পুত্রের জন্য। সে মণিপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক, তাকে দাবি করব না। কিন্তু তোমার ওপর আমার অধিকার ছাড়ব কেন?

স্বামী, বভ্রুবাহন নাবালক, মা ছাড়া সে কাউকে চেনে না। শুধু তার জন্য আমাকে থাকতে হবে। বাবা হয়ে তুমি যা পার, মা হয়ে আমি তা পারি না। আমার বুকের অর্ধেকটা যেমন তোমার জন্য কাঁদে, তেমনি বাকি অর্ধেকটা এক অপত্যস্নেহে আমাকে নিশ্চল করে রেখেছে। বিশ্বাস কর, তাকে ছাড়া বাঁচব কী করে? তোমার তো অন্য স্ত্রীরা আছে, কিন্তু তার আমি ছাড়া কেউ নেই। আমার বেঁচে থাকাটা এখন তার জন্য। লক্ষ্মীটি অবুঝ হয়ো না।

তোমার ওপর স্বামীত্বের অধিকার ত্যাগ করব কেন?

তোমার অধিকার ছাড়ার কথা উঠছে কেন? আমি তোমার আছি, থাকবও চিরকাল।

তাহলে আমার যাত্রাপথের সঙ্গী হও। আমি রক্তমাংসের মানুষ চাই। স্বপ্নের বিছানায় শুয়ে রাত ভোর আমার কল্পনায় তোমাকে পেতে চাই না।

তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও মন চায় না। কিন্তু কী করি বল? আমি যে মা! সন্তানের কথা আগে ভাবতে হবে। স্বামী, এখন আমরা নিজের জন্য বাঁচি না, সন্তানের জন্য বাঁচি। বভ্রুবাহনের বাবা হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক থাকবেই বাকি জীবন। তুমি মণিপুর ছেড়ে গেলেও মুছে ফেলতে পারবে না আমাদের সম্পর্ককে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন বাকি জীবনটা তোমার মতো করে বাঁচ। নিজেকে নবীকৃত করার জন্য, জীবনের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য, সময়ের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং বদলে চলার নাম জীবন। আমি জানি, তুমি একা থাকতে পার না, একা থাকা বড় কষ্টের। নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমাকে নিরানন্দ করো না।

রানী আমি ফিরে যাব বলে আসিনি, নিজেকে ভারশূন্য করতে এসেছি। এ জীবনে এখনও অনেক কিছু করা বাকি। শর্তের ফাঁসে জড়িয়ে গিয়ে কত সুন্দর কিছু করা হল না। বভ্রুবাহনের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক গড়ে উঠল না। তোমার সঙ্গে বসে দু'জনে একসঙ্গে নিবিড় করে প্রেমালাপ করা হল না। একটু মন খুলে কোনোদিন ঝগড়া করা হল না। এই খেদ আমার মরলেও যাবে না।

স্বামী, না বলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে, বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু নিরুপায় আমি। এরই মধ্যে কেন ভাবছ জীবনটা অর্থহীন হয়ে গেল? তুমি তো বলেছ প্রিয়তম, বাঁচতে তারাই পারে যারা তীব্রভাবে বাঁচতে জানে।

রথে যেতে যেতে আচমকা কথাগুলো তার মনে পড়ল। আর তাতেই সারা শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত পুলক জাগল। নিজের মনেই হাসল। তাকে একা একা হাসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করল, হঠাৎ হাসলে যে বড়?

অর্জুনের দু'চোখে উৎফুল্লভাব। বলল, নিজেকে নিয়ে এক আশ্চর্য খেলা শুরু করেছি। কোথায় শেষ হবে কে জানে? প্রভাস থেকে দ্বারকায় আসা হয়তো একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

চোখের তারা ঘুরিয়ে কৃষ্ণ প্রশ্ন করল, লক্ষ্য তাহলে কে?

কৃষ্ণের প্রশ্নে সহসা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অর্জুনের বুক। সহসা কথা বলতে পারল না। কৃষ্ণ কৌতুক করে বলল, পঞ্চশরের ধনু তোমার ভুরু যুগল। তোমার আঁখির কটাক্ষে মদনের ফুলশর। অতনুর তূণ তোমার স্কন্ধ। তোমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি সমাবেশের মধ্যে কাকে খুঁজছিল?

কৃষ্ণের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় অর্জুন রাঙা হয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, সখা, আমার ক্ষণিক চিত্ত দৌর্বল্যতা নিয়ে পরিহাস করছ? এ বুকে শূন্যতার যন্ত্রণা যে কতখানি তুমি জান না। তাই সমাবেশে যাদবরমণীদের দিকে তাকিয়ে একজন দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদাকে খোঁজা কী খুব দোষের?

সখা কী আমার ভগিনীতে অনুরক্ত? সুভদ্রা অত্যন্ত মিষ্ট ভাষী কোমল স্বভাবের মেয়ে। মধুরতর তার সান্নিধ্য। তুমি কি তাকে বিবাহ করতে চাও?

চাইলেই কী সব পাওয়া যায়?

তা অবশ্য ঠিক। ভগিনী তোমাতে অনুরক্ত কি না জানি না। তবে, তুমি চাইলে পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পার। তাঁর সম্মতিই সব। এখানে আমার কিংবা অগ্রজ বলরামের মতামতের কোনো দাম নেই। তাঁর কন্যাকে কার হাতে অর্পণ করবেন পিতাই স্থির করবেন। ভগিনীকে বিবাহে সম্মত হলে আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি ভগিনীর পছন্দ কি-না জানি না। ভগিনীর মনে এখন কিসের হাওয়া বইছে, তাও জানি না।

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুনের সুভদ্রার আকর্ষণ প্রবল হল। মনে হল, এমন নারীকে সহধর্মিনীরূপে না পেলে জীবন নিরর্থক হবে। সুভদ্রার মতো রমণী পারে শূন্য মনের সব যন্ত্রণার ইতি ঘটাতে। কিন্তু সহজলভ্য নয় সে। কৃষ্ণ তার সখা হলেও এ জীবনে সুভদ্রাকে বধূরূপে পাওয়ার বাধা অনেক। কারণ তারা পরস্পরে মামাতো পিসতুতো ভাইবোন। পারিবারিক বাধা একটা আসবেই। কৃষ্ণের সমর্থন থাকলে পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এমন কাজ করবে না। আবার তার সঙ্গে শত্রুতাও করবে না। সে নিরপেক্ষ থাকবে। ঘটনার ওপর নজর রাখবে। প্রয়োজন হলে হস্তক্ষেপ করবে। কৃষ্ণের ওপর এই বিশ্বাস নিয়ে তাকেই স্থির করতে হবে সুভদ্রাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্য ঠিক কী করা উচিত? হঠাৎ মনে হল, এরকম ক্ষেত্রে মহামতি ভীষ্মের পথই শ্রেয়। করুণা, অনুগ্রহ, দয়া চাইলে বিরোধীরা পেয়ে বসে। প্রেম নোংরা হয়ে যায়। তার কোনো গৌরব থাকে না। উল্টে অন্য পক্ষের মান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি। মিথ্যে হয়রানি করে নিজেকে হেনস্তা করা হয়। তাই, পিতামহ ভীষ্ম কাশীরাজের দয়া, করুণা, অনুগ্রহের ওপর নির্ভর না করে বীর্যবলে স্বয়ম্বরসভা থেকে কাশীরাজ কন্যাদের হরণ করে প্রমাণ করলেন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পৃথিবীতে বীরেরাই শুধু কদর পায়। এ হেন অপহরণে দুর্নামের বদলে সুনাম ও খ্যাতি দুইই বাড়ে। বীর্যবলে সুভদ্রাকে হরণ করে যে প্রেম অর্জুন জয় করবে তাতে দুঃখও যেমন আছে, আনন্দও তেমনি আছে।

অর্জুনকে নীরব দেখে কৃষ্ণ বলল, হতাশ হলে বন্ধু।

হতাশ হওয়ার মতো তো কিছু হয়নি। তুমিও জান, অর্জুন তার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আপোস করে না। আমার চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যবর্তী হয়ে আছ তুমি। আমার সব সংকোচ, দ্বিধা তোমার কথা ভেবেই। তোমার অসম্মান হয় এমন কিছু করতে বলো না আমায়।

আমিও তোমার সাধ পূরণের প্রতিবন্ধক হব না। তবে, তোমার যে খুব কাজে লাগব তাও মনে হয় না। যাই কর, লোক হাসিও না যেন।

কৃষ্ণের সংশয়ে অর্জুনও দ্বিধাগ্রস্ত হল। তা হলে কি কৃষ্ণ তার বীর্যাবর্তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না? সুভদ্রাকে অপহরণ করলে সমগ্র যাদবেরা বিশাল বাহিনী নিয়ে রে রে করে ছুটে আসবে। কার্যত, পর্যাপ্ত অস্ত্র, দ্রুতগামী রথ, উত্তম অশ্ব সারথিও তার নেই। যদিও বা এসব জোগাড় হয় তাহলেও এতবড় একটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। এ অবস্থায় বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য যদুবাহিনী যদি আক্রমণ করে তাহলে সমূহ বিপদ হতে পারে তার। তাই অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কৃষ্ণ ভালো করে তাকে একবার ভাবতে বলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অর্জুন বলল, আমার করণীয় কী তুমি বলে দাও। সবচেয়ে ভালো হয় স্বয়ম্বর করলে।

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলল, স্বয়ম্বর সভায় সুভদ্রা যে আদৌ তোমাকে বরমাল্য দেবে তা নিশ্চিত নয়। তোমাকে তার পছন্দ নাও হতে পারে। নারীদের মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। বর পছন্দের সময় তারা পুরুষের রূপ, গুণ, ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, যশ, অর্থ, বিত্তকে বড় করে দেখে। কোনটা কার কাছে বড় সে নিজেও ভালো করে বোঝে না। স্বয়ম্বর সভায় হঠাৎ কোনো আকর্ষণে বর নির্বাচনের পূর্ব সিদ্ধান্ত যে বদলে যাবে না, স্বয়ং পাত্রীও তা বলতে পারে না। এক্ষেত্রে, স্বয়ম্বরে পাত্রীর মর্জির ওপর নির্ভর না করে কন্যাহরণ করতে পার। সেটা কোনো ক্ষত্রিয় বীরের নিন্দনীয় কর্ম নয়। তোমাদের পরিবারের কন্যা অপহরণের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ভগিনীকে সহধর্মিনী করে পেতে হলে এটাই তোমার সর্বশেষ উপায়। তোমার সঙ্গে একটা মধুর ও প্রীতিপূর্ণ পারিবারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে আমিই সবচেয়ে খুশি হব। মুখে না বললেও তুমিও অনুরূপ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতখণ্ডে এসেছ। তোমার মতো রাজনৈতিক সচেতন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এটাই তো প্রত্যাশা করব।

অর্জুনের অধরে গর্বিত হাসি। বলল, সখা, অপহরণের পথ সংঘর্ষের পথ। প্রতিরোধের জন্য চাই রথ, অশ্ব, অস্ত্র এবং সারথি। এসব কোথায় পাব?

এসব না ভাবলেও হবে। আমার বিশ্বস্ত সারথি সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

পাঁচ

রৈবতক পর্বতে প্রতিবছরের মতো এবারও জাঁকজমক করে সোমনাথ পুজো হচ্ছিল। তবে বিশেষ অতিথিরূপে অর্জুন উপস্থিত থাকার জন্য উৎসবকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সুভদ্রা হরণের একটা পরিকল্পনাও ছকা হয়েছিল। গোটা ব্যাপারটা কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। স্থির হল, সুভদ্রা মন্দিরে পুজো করতে গেলে পথেই তাকে রথে তুলে নেবে অর্জুন। পলায়নের পরের দিনগুলো যাতে বিষময় না হয় সেজন্য কৃষ্ণের বিবেক অর্জুনকে ভাবতে বলল, তুমি যেমন আমার প্রিয়, তেমনি ভগিনীও আমার অত্যন্ত আপনার। তোমাদের দাম্পত্যজীবন শান্তির হোক। কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে সকলের অমতে। কার্যত, যাদবদের তোয়াক্কা না করে বীর্যবলে তুমি ভগিনীকে হরণ করছ। কিন্তু তারা তোমায় ছাড়বে না। একটা বড় ধরনের সংঘর্ষ হবেই। কিন্তু ভগিনী আমার নির্দোষ। শুধু চিরস্থায়ী আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছে নিয়ে তোমাকে সমর্থন করছি। অন্যায় হচ্ছে জেনেও তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি। তাই বলে আমার সমর্থনকে সম্পূর্ণ বিবেকহীন করতে পারি না। এই বিয়েটা যাদব পরিবার মেনে নেবে না। তাই সুভদ্রা দোষী না হয়েও সকলের চোখে দোষী হয়ে থাকবে। হয়তো তার দ্বারকায় ফেরার পথও খোলা থাকবে না। সে ভীষণ একা হয়ে যাবে। তার নিজের বলতে তখন শুধু তুমি। তুমিই তার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তোমার আরো স্ত্রী আছে। তার মতো অভিমানিনীর প্রতি কতখানি নজর দিতে পারবে, তুমি জান। সখী কৃষ্ণার শাসন, ভর্ৎসনা, আকর্ষণ আর অভিমান, অধিকারবোধ তোমার ও সুভদ্রার প্রেমের মধ্যবর্তী হয়ে কিছু সমস্যাতো সৃষ্টি করবে। তাই বলছিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দাও। তাঁর অনুমতি চাও। এদিকে রৈবতকের উৎসবের প্রস্তুতি চলুক। তুমিও নিজেকে প্রস্তুত কর। যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন, ভগিনীর পারিবারিক স্বীকৃতি ও সামাজিক সম্মান দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মতি তোমার নৈতিক বল বাড়িয়ে দেবে, ভগিনীও উৎকণ্ঠামুক্ত থাকবে।

অর্জুন বলল, ভ্রাতার মতোই কথা বলেছ। ভগিনীর জীবন নিরাপদ করা তোমার কর্তব্য। কিন্তু অতি আদর্শবান ছেলের ছাড়পত্র বুকে এঁটে সুভদ্রা হরণের মজা কী, সুখই বা কী?

অনির্বচনীয় হাসল কৃষ্ণ। বলল, হ্যাঁ আনন্দ ও আতঙ্ক মিশ্রিত শিহরনের ভাগ তাতে কম হবে ঠিক, কিন্তু পদে পদে বিপদ-বাধা উত্তরণের জন্য লড়াইয়ের তীব্রতা

কিংবা জয়ের উত্তেজক অনুভূতির চমকানো আনন্দ বুকের মধ্যে ঠিকই স্পন্দিত হতে থাকবে। তার সুখও কিন্তু কম নয়।

সখা, কোনো কারণে যদি অগ্রজ যুধিষ্ঠির আমার কার্য অনুমোদন না করেন, তাহলে কী হবে?

মজা করার জন্য কৃষ্ণ বলল, তাহলে সুভদ্রা হরণের নাটকের যবনিকাপাত হবে।

সখা, সুভদ্রার পাণিগ্রহণের জন্য আমার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হয়ে আছে। তাকে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে যাদবকুলের বিরুদ্ধে একা লড়ব। দয়া করে তুমি শুধু আমাকে ত্যাগ কর না। একদিন তোমার জন্য দ্রৌপদীকে পাইনি, সেই সময় থেকে আশ্রয়হীন, সঙ্গীহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সুভদ্রাকে হারালে আমি সব হারাব। তাই দরকার হলে তার জন্য অনেক যুদ্ধ করব। এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধে জিতব। শুধু সুভদ্রার প্রেমের জন্য আমাকে জিততে হবে।

কৃষ্ণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। বীর্যের সঙ্গে তেজস্বিতা, কর্তব্যের সঙ্গে প্রেম, পৌরুষের সঙ্গে মানবিকতার আশ্চর্য সমন্বয় অর্জুনকে এক অপরূপ শ্রী দিল। অর্জুনের এ রূপ আগে দেখেনি কৃষ্ণ।

দূত মারফত অর্জুনের বার্তা যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছল। অধরে বিচিত্র এক খুশির হাসি ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে বুক থেকে একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। মনে হল, অনেককাল পরে গলার কাঁটাটা নেমে গেল তার। অর্জুন অনুগত এবং বাধ্য তার। তবু দ্রৌপদীর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী সে। অর্জুনকে পাঁচ বছরেও সে ভুলতে পারেনি। এখনও তাকে ভীষণ ভালোবাসে। তাই, তার জন্যই প্রেমে উষ্ণতা নেই তার, নিবেদনে আনন্দ নেই, আলিঙ্গনে উচ্ছ্বাস নেই। দেহমনের এই বিরোধ নিয়ে রোজ যে সহবাস, তার মধ্যে পৌরুষের গর্ব কিংবা স্বামীত্বের অহংকার কিছু থাকে না। কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করে অর্জুন কার্যত দ্রৌপদীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, অর্জুনের শূন্য হৃদয়খানি সুভদ্রা একসময় দখল করে নেবে। তখন অর্জুনের প্রেমে দ্রৌপদী কোনো মজা পাবে না। ক্রমেই অনুরাগের রঙ ফিকে হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে উভয়ের মনের দূরত্ব বাড়বে। হৃদয়ের বন্ধনও শিথিল হবে। আচমকা এরকম একটা অনুভূতিতে যুধিষ্ঠিরের বুকে সুখের তরঙ্গ বয়ে গেল।

সংবাদটা যুধিষ্ঠিরই দ্রৌপদীকে দিল। সংবাদ শুনে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠতে

লাগল। মনে হল কী যেন হারাল সে। বুক জুড়ে অসীম শূন্যতা তার। মনের কাছেই প্রশ্ন করল এও কি সম্ভব? অর্জুন এত নিষ্ঠুর হতে পারে তার ওপর? স্বগতোক্তি করে বলল, মানুষের মন বড় বিচিত্র। কোন্ অভিমানে সে আমাকে এত দিন ধরে শাস্তি দিচ্ছে ধর্মরাজ? আমি তো সকলকে নিয়ে সকলের হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম কৈ? ধর্মরাজ তুমিই হতে দিলে না। আমার জীবনটা তোমার লোভে, মোহে নয়ছয় হয়ে গেল। পার্থের ওপর আমার দাবি, অধিকারে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে নির্বাসনে পাঠালে তুমি। তাকে নির্বাসিত করে আমার মন পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলে। পাছে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাই আমার আবেগ, উচ্ছ্বাস, আমার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অর্জুনের জন্য যে প্রেমকুঞ্জ রচনা করি মনের অভ্যন্তরে তুমি তার নীড় ভেঙে দিলে। আমার নিজের বলে আর কিছুই রইল না।

যুধিষ্ঠির ধরা পড়ার বিস্ময়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। বলল, তুমি এসব কী বলছ! অকারণে দূষছ আমাকে। মনে পড়ে, যেদিন জানলে অর্জুন উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছে এবং অর্জুন সন্তানের পিতা হয়েছে সেদিনই তুমি প্রশ্ন করলে একনিষ্ঠতাই যদি প্রেমের মূলকথা হয় তাহলে অর্জুনের একনিষ্ঠতা কোথায়? বহু নারীকে প্রণয় নিবেদন করেও যদি পুরুষ প্রেমে একনিষ্ঠ হয় তাহলে একাধিক পুরুষের ভার্যা হয়েও তোমার বুক কেন ভরে থাকবে না অর্জুনের প্রেমের সৌরভে।

অর্জুনের কথা মনে হতেই দুঃখ আর অভিমানে তরঙ্গ বয়ে গেল দ্রৌপদীর বুকে। রাগ হল যুধিষ্ঠিরের ওপর। বলল, আমাকে কাছে না পাওয়ার অন্তর্গূঢ় আকুলতাই তাকে উলুপী, চিত্রাঙ্গদা অন্বেষণে বাধ্য করেছে। এছাড়া শূন্যতা ভোলার বিকল্প কিছু ছিল না। এসবের জন্য দায়ী হলে তুমি। তার প্রতি আমার অন্তরের টানকে তুমি ঈর্ষা করো। আমার সব রাগ, অভিমান যে তার ওপর এটা জেনেই তুমি কৌশলে আমাকে বিচ্ছিন্ন করলে। তবু সে আমার রূপকথার রাজপুত্র। তার মহৎ প্রেম, উদার ভালোবাসাকে তুমি অপমান করেছ। তাই তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমায় জব্দ করল এভাবে। তার জীবন থেকে চিরতরে আমি হারিয়ে গেলাম।

যুধিষ্ঠির নীরব। প্রস্তরীভূতপ্রায় অবস্থা তার। দ্রৌপদীর অভিযোগগুলি তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখল। অনাবিষ্কৃত মনের অনেক রহস্য হঠাৎই দ্রৌপদী তার কাছে ফাঁস করল। আত্মগোপনের আর কোনো উপায় রইল না যুধিষ্ঠিরের। তথাপি নিজের সঙ্গে নিজের এই ছলনার জন্য তার অন্তরে কোনো অনুতাপ, অনুশোচনা ছিল না, এইভাবে নিজেকে দেখা ও খোঁজা শেষ হলে যুধিষ্ঠির শান্তভাবে বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তা নিয়ে অনুতাপ করলে ভুল

শোধরানো যাবে না। প্রিয়তম, মানুষ সত্যি কি যে চায় সে নিজেও ভালো করে জানে না। এটাই তার বিড়ম্বনার কারণ। তুমি যা বললে তা স্বীকার করা কিংবা অস্বীকার করা কোনো মানে হয় না। আমার অনুভূতির মরা গাঙে তার কোনো স্রোত বয় না। যাই হোক, এ বিবাহে তাকে আমার সম্মতি দেওয়া উচিত মনে

তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল দ্রৌপদী। বলল, তুমি তো বলবেই। আমাকে সকলের কাছ থেকে একেবারে একা করে দিতে পারলেই তুমি খুশি হও।

এ তোমার রাগের কথা, বলল যুধিষ্ঠির। আমি কিছুই করছি না। সময়ের মতো আমি নিরপেক্ষ। কাল তোমাকে আমাকে অর্জুনকে এবং সবাইকে আকর্ষণ করছে তার পরিণামের দিকে। তার কোনো প্রিয় অপ্রিয় নেই। সে শুধু নিরপেক্ষ। তার কাজ সবাইকে আকর্ষণ করা। আমাকেও করেছে। তোমাদেরও করেছে। তাই বলছি, বিলাপ করে লাভ নেই। সব সময় নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করো তাহলে শান্তি পাবে। আমি যা করেছি সকলকে শান্ত রাখার জন্য এবং শান্তিতে থাকার জন্য করেছি।

দ্রৌপদী ঝংকার দিয়ে বলল, মিথ্যে কথা। যা করেছ তোমার নিজের সুখের জনই করেছ।

করেছি কালের প্ররোচনায়। তুমি তো অহল্যার মতো পাষাণ নও। রক্তমাংসে গড়া সুন্দরী নারী। তোমার হাতের স্পর্শ সুন্দর, তোমার দেহের সান্নিধ্য এবং তার শান্ত উত্তাপও সুন্দর। তোমার সেবা মনোরম। অথচ, তোমার গভীর কালো চোখে প্রণয়ের কোনো প্রকাশ নেই। আমার কোনো কামনা তোমার প্রাণে তরঙ্গ তোলে না। অথচ, তুমি জানো আমি কী চাই। কাঙালের মতো তোমার কাছে হাত পাততে আমার লজ্জা নেই। তবু তোমার মুখে সামান্য ভাবেরও পরিবর্তন দেখতে পাই না। রজনীর নির্জন একাকীত্বের মধ্যে লয় হয়ে গিয়ে নিজের মনে কত কথা বলি তোমাকে। কারণ তুমি একমাত্র প্রাণী যে আমার একান্ত কাছে থাকো। অথচ, কী আশ্চর্য তুমি শুনতে পাও না, আমার মুখের ভাষাও বোঝো না। বলো তো এই নীরব সঙ্গ কারো ভালো লাগে? মানুষের ভোগ সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষার আদি অন্ত নেই। সে কৃতজ্ঞতা জানে না। ভাই মানে না। সেই ঘুমন্ত পুরুষসিংহের দেহে মনে বেত্রাঘাত করে তাকে ক্ষিপ্ত করেছ। তাকে শান্ত করার কোনো চেষ্টা করোনি। আজ তাহলে আমাকে দোষী করেছ কেন?

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রৌপদী অশ্রু গোপন করে বলল, স্বামী, সব ভ্রম। আমি এক প্রেমের ফসিল। তাই অর্জুন ছাড়া আর কারো কাছে আনন্দের স্বাদ পাই না।

কোনো চিত্ত সুখের স্মৃতি আকুল করে না আমাকে। বিশাল দুনিয়ার প্রতিও আমার আর আকর্ষণ নেই। অর্জুনের আকর্ষণের শৈথিল্য অনুভব করছি। পাঞ্চালরাজ্যে স্বয়ম্বর সভায় দেখা বীর্যবান, রূপবান, বলবান, পৌরুষদৃপ্ত অর্জুনের সেই মুখখানাও আজ হারিয়ে গেছে। ভালো করে মনেও করতে পারি না। বোধহয় আমার মনটাও মরে গেছে। এখন আমি জননী, প্রেমিকা নই। প্রেমানুভবের রঙে, স্বাদে, গন্ধে তার মনটাকে রাঙিয়ে দিতে পারব না। সে মনটাই আর নেই। অর্জুনের বঙ্কিম কটাক্ষের লুব্ধ আকর্ষণে এদেহ মন কল্লোলিত হয় না। সত্যি, এ জীবনে তাকে কিছু দিতে পারব না। সুভদ্রাকে পেয়ে যদি ভরে ওঠে, তার আকাঙ্ক্ষার চাঁদ হাতে পায় তাহলে আমি বাধা দেবার কে? বরং তার বিয়েতে যে আমারও সম্মতি আছে এই কথাটাও জানিয়ে দাও তাকে। তার করুণা করার আগে আমি তাকে করুণা করলাম।

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সম্মতি আর বিস্ময়ের অদ্ভুত এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল তার মৃদু হাস্যে। যুধিষ্ঠির বলল, তাই করব প্রিয়তম।

দ্বিধাহীন চিত্তে অর্জুন রৈবতকের উৎসবে যাত্রা করল। সুভদ্রাকে পাওয়ার পথে কোনো বাধা-বিঘ্নকে সে এখন ভয় পায় না। তবু মনের মধ্যে হরেক রকম প্রশ্ন জাগল। সুভদ্রা হরণের পরিণামের কথা চিন্তা করে একটু বিমর্ষ হল। সুভদ্রার মতো শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে ডাকাতি করে পেতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। আবার তাকে ভিক্ষে চাইতেও লজ্জা করছিল। ভিক্ষে করে কিছু পাওয়ার মধ্যে কোনো আত্মগৌরব নেই। দয়া, অনুগ্রহ, প্রেমকে ছোট করে দেয়। প্রত্যাখ্যান পেলে সে নিজে ছোট হয়ে যাবে। তাই অতর্কিতে তাকে হরণ করবে বলে স্থির করল। কিন্তু যাদবেরা মেনে নেবে না তাকে। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা পশ্চাদ্ধাবন করবে। কুলগৌরব রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে।

যুদ্ধের ভয় অর্জুন করে না, কিন্তু তার মোহের আগুনে যদি পাণ্ডবদের সাধের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেটা হবে তার পরিতাপ। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের বন্ধুত্ব হারাবে। যাদবরাজ্যগুলির মনে মৈত্রী স্থাপনের যে জমি প্রস্তুত হয়েছিল তাও বিঘ্ন হবে। বৃষ্ণিদের সঙ্গে মধুর হৃদ্য সম্পর্কের ইতি ঘটবে চিরতরে। সুতরাং এ অবস্থায় অর্জুনের কী করা উচিত ভেবে পেল না। রাজনৈতিক হঠকারিতা করে যদি জয় হয় তাহলেও পাণ্ডবরা কৃষ্ণের মতো মিত্র হারাবে। অর্জুনের দোলাচল মনের হাল ধরল কৃষ্ণ। বলল, বন্ধু, উৎসবের দুটো দিন কেটে গেল। অথচ তুমি কিছুই করলে না। তোমার মনের বাধাগুলো আমি জানি। অত ভাবতে গেলে জীবনে কোনো কাজই

করা যায় না। ভবিষ্যতে কী হবে বা কী হতে পারে সে কথা অবশ্যই ভাববে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সব বদলে যায়। এমন কি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও। তাই বলছিলাম, একবার যখন সুভদ্রা হরণের ইচ্ছে মনে জেগেছে তখন সে ইচ্ছে ত্যাগ কোরো না। আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?

সখা, তোমার বন্ধুত্ব হারানোর ভয়। যাদবদের মিত্রতা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের বঞ্চিত হওয়ার ভয়। বলপূর্বক হরণের জন্য সুভদ্রা যদি আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় তাই—

বন্ধু শুভক্ষণ উপস্থিত। যাদবেরা উৎসবে মত্ত। কোনো কিছুতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। কে কী করছে তার প্রতি তাকানোর অবসরও নেই। এটাই সুভদ্রা হরণের শ্রেষ্ঠ সময়। তুমি আর কাল বিলম্ব কোরো না। সব প্রস্তুত আছে। সংশয়ে নিজেকে ক্লিষ্ট কোরো না। কৃষ্ণের চোখের তারায় নির্ভয় প্রশ্রয়। মুখে বিগলিত হাসির প্রসন্নতা।

সোমনাথ মন্দিরের খুব কাছে ছিল অর্জুন। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বৈচিত্র্যময় ভাস্কর্য এবং কারুশোভা ও নানাবিধ দেবমূর্তির গঠন সৌষ্ঠব দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মন্দিরের অভ্যন্তরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলছে। গন্ধ ধূপ আর তীব্র সুগন্ধী অগরুর সৌরভে আমোদিত প্রকোষ্ঠে শোভা পাচ্ছে এক হাস্যোজ্জ্বল সুখী দেবসংসার।

অজানিত একটা আশঙ্কায় অর্জুনের বুক টিপ টিপ করছিল। ঠুন্‌ঠুন্ ঘণ্টাধ্বনি ক্রমেই নিকটতর হল। সেই সঙ্গে অশ্বখুরধ্বনিও। অর্জুন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। মেলার মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অল্পবয়স্ক কতিপয় তরুণ পথের ধারে দাঁড়িয়ে একটি দ্রুতগামী সজ্জিত অশ্ব-শকটের দিকে অঙ্গুলি তুলে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কীসব বলাবলি করছিল। মেলার কোলাহলের মধ্যে কথাগুলো শোনা গেল না। তবে তাদের অঙ্গুলি অনুসরণ করে অর্জুনও সেদিকে তাকাল। দেখল, সালাঙ্কারা সত্যভামা অন্যান্য পুরঙ্গনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পুজোর উপকরণ বহন করে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। দূর থেকে দেখলেও সুভদ্রাকে চিনতে অর্জুনের ভুল হল না। অমনি এক বিপুল হর্ষে তার চিত্ত প্লাবিত হল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে, তার দিকে তাকিয়ে সে কর্তব্য স্থির করছিল।

অন্তরাল থেকে কৃষ্ণ অর্জুনের ওপর লক্ষ্য রাখছিল। পিছন থেকে কাঁধে হাত রাখতে অর্জুনের সারা শরীর কেঁপে উঠল। বলল, এখনও দ্বিধা? সংকল্পে দুর্বল হতে নেই।

তাতেই আলোড়িত হয়ে উঠল অর্জুনের চেতনা। শক্ত দুটো হাত দিয়ে অশ্বের

লাগাম টেনে ধরল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল রথ। ঘাঘরার নীচে দেখা যাচ্ছিল সুভদ্রার নিটোল দুটি পা। যেন গোলাপি রঙের প্রলেপ দেওয়া। মাথার ওপর মুক্ত বেণী কোমর পর্যন্ত ঝুলছে। গায়ে রক্ত রঙের কুর্তা। মাথায় কপাল চেপে সবুজ রেশমী রুমালের ফেটি। অর্জুন দেখল, তার ভাসা ভাসা দুটি কৃষ্ণ কাজল চোখ যেন যমুনার কালো জলে টলটল করছে। তার খুব কাছে অর্জুনের রথ থামল। সুভদ্রার সঙ্গীদের বুঝে ওঠার আগেই অর্জুন একটু ঝুঁকে ডান হাত দিয়ে সুভদ্রার বাহুমূল ধরে এক ঝটকায় রথে তুলে নিল। সুভদ্রা প্রতিবাদ করল না। বরং মুগ্ধ গলায় বলল, আপনার গায়ে তো খুব জোর। অর্জুনের পেশীবহুল অথচ কোমল পেলব দীর্ঘদেহের দিকে তাকিয়ে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করল, কে আপনি? এভাবে আপনার রথে না তুললে কি হত না? এতে কি আপনার সম্মান খুব বাড়ল? কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না?

সুভদ্রার মুখে এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে অর্জুন একটু হকচকিয়ে গেল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুভদ্রা কৌতুক করার জন্য বলল, আপনি কি বোবা? কথা বলতে পারেন না? গায়ের জোরে রথে তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারবেন তো? আর যাই করুন লোক হাসাবেন না যেন। আপনার সঙ্গে আমাকেও যেন পস্তাতে না হয়।

স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরল অর্জুন। জ্যামুক্ত ধনুকের মতো টান টান হয়ে দাঁড়াল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, আমি অর্জুন। নামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ করে না কৃষ্ণসখা পার্থ।

খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুভদ্রার মুখাবয়ব। বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে তার মনটা অগ্নিদগ্ধ মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল। তার শান্ত মুখে স্মিত হাসি। যাত্রার উল্লাসে তীব্র একটা আবেগ বুকের ভেতর পাক খেয়ে কণ্ঠে উঠে এল। বলল, এমন নির্ভরতা আগে কখনও অনুভব করেনি। বিপদ আছে জেনেও কেমন নিশ্চিন্ত আছি। বিপদ বাধা ভয় করো না বলেই তুমি অর্জুন।

অর্জুনের বুকের ভেতর এ কোন সাগরের কল্লোল। উচ্ছ্বসিত আনন্দের জোয়ারে ভাসছিল সে। দ্রুত ধাবমান অশ্বখুরের ধ্বনিতে এবং রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে প্রকম্পিত হল দেবমন্দির সংলগ্ন রাজপথ। উচ্ছ্বসিত আনন্দে সুভদ্রার একটা হাত অর্জুন হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে চাপ দিয়ে একটা আশ্চর্য পুলকানুভূতিতে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

অর্জুনের দ্রুত ধাবমান রথের সামনে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি করতে কেউ এগিয়ে এল না। বরং মুহূর্তে মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেল।

সুভদ্রা হরণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। অর্জুনের আচরণে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট যাদবেরা নানা কটুবাক্যে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। গোটা দ্বারকা জুড়ে এক শোরগোল সৃষ্টি হল। কালক্ষয় না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল তারা। সমবেতভাবে অর্জুনের পশ্চাদ্ধাবন করে তার বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে সবাই বদ্ধপরিকর। প্রয়োজন হলে ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করে অসম্মানের প্রতিশোধ নেবে। দ্রুত যুদ্ধসাজে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিল বলরাম।

কৃষ্ণ কিন্তু সবার মধ্যে থেকেও একটা কথা বলল না। তার নীরবতায় সকলে বিস্মিত হল। বলরাম তো ক্ষিপ্ত হয়ে তিরস্কার করল তাকে। এই গোলমালটা তুমি পাকিয়েছ। বংশমর্যাদার চেয়ে তোমার কাছে বন্ধুত্ব বড় হল। তার মতো বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার তোমার প্রশ্রয়ে আতিথ্যের অমর্যাদা করার সাহস পেল। সমগ্র যাদবকুলের মুখে সে কালি লেপে দিল। শত্রুদের কাছে আমাদের হাস্যাস্পদ করল। তবু তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বললে না তুমি। তোমার কাছে দেশ, জাতি, বংশ মর্যাদা এসবের কোনো মূল্য নেই। ছিঃ। শুনে রাখো, তোমার বন্ধু সুভদ্রাকে নিয়ে গেল না, সে তার নিজের মৃত্যুকে রথে করে নিয়ে গেল।

কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলল, কী বলব, বলো তো? তোমাদের এই রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, আস্ফালনের কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। সমগ্র যাদবকুল এটাকে অপমান হিসেবে নিচ্ছে কেন?

অবাক হয়ে বলরাম বলল, বা! বা! চমৎকার!

কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলল, কন্যা হরণ করে অর্জুন কোনো অন্যায় করেনি। সুভদ্রা সুন্দরী। তাকে ভালো লেগেছে তার। তাই সুভদ্রাকে সকলের সামনে অপহরণ করল। ক্ষত্রিয়দের কন্যা হরণ করে বিবাহ করা প্রশংসনীয় কর্ম। অর্জুন বীর বলেই সে সুভদ্রা হরণে সাহস দেখিয়েছে। এনিয়ে তোমাদের ক্ষোভ, উত্তেজনা হতেই পারে, কিন্তু যুদ্ধ করার মতো কোনো ঘটনা এটা নয়। বরং যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হলে শত্রুরা তোমাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসবে। বীরের কন্যা হরণের জন্য কোথাও কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি। দ্বিতীয়ত, পাত্র হিসেবে অর্জুনের কোনো তুলনা হয় না। কুলশীল মানে তার মতো সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান খুব কম আছে। কুন্তীভোজের দৌহিত্র সে। বিখ্যাত ভরতবংশীয় সন্তান। একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তার সমকক্ষ বীর ভূভারতে নেই। শুধু তাই নয়, তার মতো সমরকুশলী যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতাও খুব কম হয়। সব দিক দিয়ে সে সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র। কখনও কি ভেবেছ, যুদ্ধ করে নয়, মানুষের হৃদয় জয় করে অর্জুন একের পর এক রাজ্য জয় করেছে। সুদূর পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত সে পরিভ্রমণ করেছে, কোথাও কোনো সংঘর্ষে

না গিয়ে প্রীতি ও সৌহার্দ্য বলে দেশের পর দেশ নিজের করে নিয়েছে। তাই, তার সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং মনে হয়েছে, এত সুন্দর পাত্রের সঙ্গে আমরা সুভদ্রার সম্বন্ধ করতে পারতাম কি-না, যথেষ্ট সন্দেহ হয় আমার। অর্জুন আমার ভগ্নীপতি হওয়ার জন্য গর্ব অনুভব করছি। আমাদের কুলগর্ব খর্ব না করে তাকে গৌরবান্বিত করেছে। এখন আমাদের উচিত বীরদর্পে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে সকলে মিলে তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনা। তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমরাই সুভদ্রার সঙ্গে তার বিয়ে দেব।

কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় যাদবপ্রধানেরা আপ্লুত হল।

ছয়

কৃষ্ণের ইচ্ছেতেই সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েটা একটা রাজনৈতিক রূপ পেল। ভারতের ছোট বড় সব রাজন্যবর্গই আমন্ত্রিত হল। কারণ, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপনের পর ভারত রাজনীতিতে যে সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হল তাতে রাজনৈতিক মেরুকরণটা নতুন করে যাচাই করা জরুরি হয়ে পড়ল। কে কোন পক্ষে অবস্থান করছে, সেটা বুঝে নিতেই আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হল। রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতেই প্রমাণ হবে কে কোন পক্ষে থাকল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অনুপস্থিতি মানেই যাদবরাজগুলির মিত্রতা তারা মান্য করে না। যাদব রাষ্ট্রজোটকে তারা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না।

সুভদ্রার বিয়েতে মগধরাজ জরাসন্ধ, হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন, ভোজরাজ শিশুপাল এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের নরকাসুরকে দিনের দিন দেখা গেল না। এমনকি তাদের প্রতিনিধিও এল না। কার্যত জরাসন্ধের রাষ্ট্রজোট এই বিবাহের নিমন্ত্রণকে বর্জন করল। ফলে, কৃষ্ণের চিনে নেওয়া সহজ হল। কারা শত্রু কারা মিত্র সুভদ্রার বিবাহ মঞ্চেই স্থির হয়ে গেল। এদের কেউ যাদব সমবায় রাজ্য এবং পাঞ্চাল রাষ্ট্র জোটের সঙ্গে কোনো সৌহার্দ চায় না। বৈরীতাকেই জিইয়ে রাখল।

যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতিটা সবার চোখে পড়ার মতো ঘটনা। অনেকেই সেটা উপভোগ করল। বেশ কিছু ছোট ছোট রাজন্যবর্গ এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে সরস কৌতুকও করল।

শুরুটা বৈশালীরাজই করল। আক্ষেপ প্রকাশ করে বলল, যে পাণ্ডবদের ধরে কৃষ্ণ বৈতরণী পার হতে চায়, বিবাহমঞ্চে তারাই এল না।

উশীনর নরপতি একগাল হেসে বললেন, কৃষ্ণের চালাকিটা যুধিষ্ঠির বুঝে

ফেলেছে। ভগ্নীর সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থকে দলে টানবে ভেবেছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরই তা হতে দিল না। রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে না থেকে যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

বিরাট রাজ বিচক্ষণের মতো বললেন, যুধিষ্ঠির ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। বাইরে থেকে তাকে খুব নিরীহ ভালোমানুষ বোধ হবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ভীষণ চালাক এবং ধূর্ত। বিড়াল তপস্বীর মতো চুপচাপ থাকে। ঐ চুপ করে থাকাটাই হল ভয়ংকর। বিজয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অর্জুনের কাছ থেকে কত সহজে কেড়ে নিল। পাছে সে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাই তাকে কৌশলে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল। কৃষ্ণের সহায়তায় সে আবার ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরুক এটা যুধিষ্ঠির চায় না। পাছে কৃষ্ণের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়, তাই যুধিষ্ঠির কিংবা তার কোনো ভাই-ই অর্জুনের বিয়েতে হাজির হল না। হাজির হওয়া মানে সে আর নিরপেক্ষ থাকল না।

অন্ধক রাজ বক্তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, ঠিক বলেছ ভায়া। ওই মানুষটার রাজনীতি আমি ঠিক বুঝি না। রাজার সঙ্গে রাজার বিরোধ বাধলে কিংবা সংকটে পড়লে রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হয়। নির্লোভ এবং সাধুব্যক্তির এই তকমা তাকে জনগণের খুব কাছে করেছে। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতেই সে জনতার মধ্যে নেমে এসে জনমত সৃষ্টি করে রাজশক্তির ওপর এক নিঃশব্দ আঘাত হানে। কিন্তু সে মোক্ষম আঘাতের ধাক্কা সামলাতে শক্তিমান রাজাকেও হিমসিম খেতে হয়। কৌরবদের না চটিয়ে, তাদের সঙ্গে হানাহানি না করে কত সহজে ইন্দ্রপ্রস্থে নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করল। তাই ওই মানুষটির নীরবতাকে আমি ভয় পাই। মনে মনে নিশ্চয়ই কোনো বড়রকম মতলব ভাঁজছে।

বিদর্ভ রাজ সব শুনে বললেন, কথাটা মন্দ বলনি। তবে জন্ম থেকেই ওরা বনে বড় হয়েছে। বনের সঙ্গে ওদের আজন্ম প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক। বনেই ওরা বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাই ছলছুতো করে সেই বনেই ফিরে আসে। বন ওদের ধাত্রী, ওদের আশ্রয়দাতা। বন ওদের ভীষণ টানে বলেই বনের কাছে ফিরে যায়। বন শুধু ওদের দিয়েছে, নেয়নি কিছুই। এজন্য বনের কাছে ওরা কৃতজ্ঞ।

উশীনর নরপতি বলল, আমাদের আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দিচ্ছ কেন ভাই? আমাদের কথা হচ্ছিল, অর্জুনের মতো ভাইয়ের বিয়েতে যুধিষ্ঠির না এসে থাকতে পারল? ধরে নিলাম, কোনো কারণে ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু অন্য ভাইরা তো দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে আসতে পারত? কিন্তু এল না। কেন এল না জান? পাছে দ্রৌপদীকে হারাতে হয়। তাই একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলল।

বিরাট রাজ বলল, উল্টোটা তো হতে পারে। পাছে নববধূ সুভদ্রাকে দ্রৌপদী সহ্য করতে না পারে যদি ঈর্ষা-সিন্ধু মন্থনজাত বিষে তার অনুরাগদীপিত মনটি বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই অর্জুনই চায়নি ইন্দ্রপ্রস্থের কেউ এসে তাদের নতুন সম্পর্কের মধ্যবর্তী হয়ে একটা প্রাচীর তুলে দিক। সব কিছু মিটে গেলে সময়ের সঙ্গে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। প্রাথমিক ভাবাবেগের ধাক্কাটা সময়ের ব্যবধানে ফিকে হয়ে যায়। সেই সময় সুভদ্রাকে মেনে নিতে দ্রৌপদীর আর কষ্ট থাকবে না।

অন্ধক রাজ বলল, এসব কৃষ্ণের চালাকি। সে ব্যাটা নিজেই যুধিষ্ঠিরকে আসতে মানা করেছে। কারণ সে এখানে না এলে নিমন্ত্রিতরা তার অনুপস্থিতি নিয়ে নানা জল্পনা করবে। এখানে তাকে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি করার জন্যই কৃষ্ণ তাকে আসতে নিষেধ করেছে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। তার নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির গায়ে একটুও আঁচড় লাগবে না। এমনও হতে পারে, যুধিষ্ঠির যাদবরাষ্ট্র জোটের বাইরে থাকার জন্যই স্বেচ্ছায় আসেনি।

বিদর্ভরাজ, বিজ্ঞের মতো বলল, তোমরা যে যার নিজের মতো ব্যাখ্যা করে অনর্থক জল ঘোলা করছ। অর্জুন ও সুভদ্রার বিয়ে মানেই যুধিষ্ঠির আর নিরপেক্ষ নয়। সে যাদবদের আত্মীয় এবং কেউ না বললেও তাদের রাষ্ট্রজোটের মধ্যেই আছে। সুভদ্রা ও অর্জুনের বিবাহ সভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের কাছে সেই সত্যটা প্রকাশ করল।

উশীনর নরপতি অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, এটা একটা দিক হতে পারে। কিন্তু দ্রৌপদীকে নিয়ে তাদের ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে নিরন্তর ঠাণ্ডা লড়াই লেগে আছে সেখানে অর্জুনই বড় প্রতিপক্ষ। কারণ, দ্রৌপদীর সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে আছে অর্জুন। প্রেমের বঞ্চনা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। সেজন্যই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে অর্জুনকে সরে যেতে হল। বারো বৎসর তার ব্রহ্মচারীর মতো জীবন যাপন করার কথা ছিল। এই সময়ের মধ্যে কোনো নারীসঙ্গ করার কথা নয়। কিন্তু অর্জুন কিছুই মানেনি। সে যথারীতি নারীসঙ্গ করেছে, নারীকে সন্তান দিয়েছে। ঘর-সংসারও পাতিয়েছে। অবশেষে কৃষ্ণসখার ভগিনীকে বিয়ে করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফেরার পরিকল্পনা করছে। এবার সে একা নয়, তার পিছনে রয়েছে একটি রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন। সুভদ্রাকে বিয়ে করার পূর্বেই অর্জুন যে একা নয়, নগণ্য নয়, এটা জানিয়ে দিয়েছিল। তাই যুধিষ্ঠিরকে ঘটনার ওপর নজর রাখতে ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে আসেনি। প্রয়োজন হলে যাদবদের বিরোধী শিবিরে যাওয়ার পথ খোলা রাখল।

বিরাট রাজ বলল, এভাবে নিজের মতো ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া ঠিক নয়। বিয়ের প্রথম রাত থেকে অর্জুনকে পায়নি দ্রৌপদী। অর্জুনের ফাঁকা জায়গাটা অন্য কেউ পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু অর্জুন দ্রৌপদীকে হারিয়ে নিজে হারিয়ে যায়নি। তাঁর

শূন্য হৃদয়ে উলূপীকে বসিয়েছে, চিত্রাঙ্গদাকে মহিষীর আসন দিয়েছে। তবু তারা কেউ অর্জুনের সারা জীবনের সঙ্গিনী হল না। কিন্তু সুভদ্রা তার জীবন সঙ্গিনী হল। তার ওপর অর্জুনের একার দাবি। সেজন্য সুভদ্রাকে মানতে পারছিল না দ্রৌপদী। দ্বারকায় তার আগমন সুখের হতো না। তাই অর্জুন মন থেকে দ্রৌপদীকে বিয়ের আসরে চায়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে দ্রৌপদীর আপত্তিতে অন্য পাণ্ডবরা আসেনি। বোধ হয়, এটাই যুধিষ্ঠিরের না আসার একমাত্র কারণ। যুধিষ্ঠির না আসার জন্য অর্জুন কিছুই হারাল না। বরং সে অনুপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের উপকার করল।

অন্ধকরাজ বলল, কেমন ভাবে।

বিরাট রাজ বলল, যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করল দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রজোটের ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু সে। তাদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি সম্বল করে রাষ্ট্রজোটের একটা বৃহৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা যে সম্ভব সেটা বৃহৎ রাষ্ট্রজোটের সকলে অনুভব করছে। জোটের স্বার্থে সৌভ্রাত্র ও মৈত্রী বন্ধনে পাণ্ডবদের ভাবমূর্তি একটা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে।

আলোচনাই শুরু করেছিল বৈশালী রাজ। কৃষ্ণকে আসতে দেখে আলোচনার উপসংহার টেনে দিতেই বললেন, এই বিবাহসভায় প্রমাণ হয়ে গেল পাণ্ডবেরা আর নিরপেক্ষ নয়। নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে তারা যাদবরাষ্ট্রজোটের পক্ষচ্ছায়ায় আছে। এরকম একটা ধারণা প্রতিপক্ষ জোটকে সর্বক্ষণ চাপে রাখবে। সুভদ্রা অর্জুনের বিয়েতে তার পটভূমি সৃষ্টি হল শুধু।

বিয়েটা নির্বিঘ্নেই চুকল। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পাণ্ডবদের কেউ এল না বলে মনটা ভালো ছিল না সুভদ্রার। মনের মধ্যে কেবলই তার কু গাইছিল। জীবনটা পরবর্তীকালে কতটা সুখের হবে সেই ভেবে তার ভেতরটা অস্থির হচ্ছিল। কেবলই মনে হতে লাগল, জেনে শুনে নিজের অশান্তি নিজেই ডেকে আনল। পরক্ষণে নিজে প্রশ্ন করল, সত্যি কী তাই? এর মধ্যে একটুও কি তার নিজের ভালোলাগা ছিল না?

অর্জুনের সঙ্গে তার বিয়ে হোক এটা কৃষ্ণ ভীষণ করে চাইত। বৈমাত্রেয় ভাই হলেও সে ছিল কৃষ্ণপ্রাণ। তাই মুখে অর্জুন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তার কথা শুনতে ভালো লাগত। এক আশ্চর্য সুখে দেহমন ভরে যেত। তার মন পাখি দু'ধারে পাখা মেলে দিয়ে নীল আকাশের মাধুরী পান করতে করতে আকাশগঙ্গায়

ভাসত। অজ্ঞাত রহস্যলোকের পর্দাটা সরিয়ে কৃষ্ণ যে কখন তার মনটাকে দেখে ফেলেছে বুঝতে পারেনি। কতদিন স্বপ্নে দেখেছে অর্জুন তার হাতের ওপর মুখ রেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কী সরল নিষ্পাপ ওর আলোয় ধোয়া সুন্দর মুখ। কথাটা মনে হলেই গায়ে কাঁটা দিত। আজও কাঁটা দিল। সোমনাথ মন্দিরে পুজো করার সময় দু'হাত জোড় করে প্রার্থনা করত—ওগো প্রেমের ঠাকুর আমার হাতে অরূপ রতন দিও। আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না। ধ্যানের মধ্যে দেখতে পেত দু'হাতের করপদ্মে অর্জুন মুখখানি তুলে ধরেছে তার পিপাসিত অধরের খুব কাছে। সমস্ত শরীরে ও অধরে ক্ষণে ক্ষণে তার স্পর্শ অনুভব করেছে সে। কী ভালোই না লাগত সেই মুহূর্তটা। এখনও মনে হলে আকাশ জোড়া বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত হয় তার দেহ মন।

চেতনার ভেতর থেকে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেদিনের একটা ছবি। রৈবতক মন্দিরে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে পুজো দিতে যখন মন্দিরে ঢুকছে, হঠাৎ কোথা থেকে অর্জুন এসে ঈগল পাখির মতো ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল তাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য সে একটু বাধাও দিল না। চিৎকার করে লোক জড়ো করল না। বরং, দু'হাতে অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে রথে উঠল। এক অদ্ভুত প্রত্যাশা পূরণের সুখ ও আনন্দে তার বুদ্ধির কেন্দ্রটা শিথিল হয়ে গেল। তাই নিজেকে অর্জুনের ভুজবন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোনো চেষ্টা করল না। পরাজিত হবার জন্য তার সত্তা উন্মুখ হয়ে রইল। মনের ভেতর তখন ভালো লাগার তুফান। নিজের মনেই বলছিল, সব নারী চায় পুরুষ তাকে বীর্যবলে জয় করুক। জয়ের গৌরব মাল্য দিয়ে তাকে বরণ করুক। তার যা কিছু আছে সব দস্যুর মতো লুণ্ঠন করুক। অথবা কাঙালের মতো ভিক্ষা করুক। তবে পুরুষের কাঙালপনা তার পছন্দ নয়। অমন পুরুষকে ভালো লাগে না তার। তবু কেউ যদি দয়া, করুণা, অনুগ্রহ, কৃপা ভিক্ষে করে তাহলে 'না' বলে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু অর্জুন বীর। সে কৃপা চায়নি। আপন বীর্যাবর্তার গৌরবে তাকে জয় করে গর্বিত করেছে। সবার বিপক্ষে গিয়ে অর্জুন যেভাবে হরণ করে নিয়ে গেল, তার ভেতর একটা দুঃসাহসিক উত্তেজক আনন্দ এবং নবনব আশঙ্কা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার আতঙ্কে স্নায়ুর মধ্যে যে দুরন্ত উন্মাদনায় টাটাছিল তা সুভদ্রার কাছে জীবনের প্রকৃত মানেটা বদলে দিল। অর্জুনকে জীবনের ধ্রুবতারা মনে হল। তখন সুভদ্রার খুব ইচ্ছে হয়েছিল অর্জুনের গলা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে বলতে, আমার দেহমন জুড়ে সুরের তরঙ্গ তুলেছে—সে তো তুমিই। এ পৃথিবীতে আমার আর কাউকে চাই না, শুধু তুমি আমার হয়ে যাক। সেই আমার যথেষ্ট। কিন্তু মুখের কথা বুকেই রয়ে গেল।

কক্ষে ঢুকেই অর্জুন দেখল সুভদ্রা অন্ধকারের মধ্যে একা নিঝুম হয়ে বসে আছে। খোলা জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার যেটুকু আলো ঘরে পড়েছে তাতে অন্ধকারটা পাতলা হয়েছে। সুভদ্রার ছায়া অবয়বের দিকে তাকিয়ে সে একটু আশ্চর্য হল। বলল, আলো জ্বালনি? ভূতের মতো বসে আছ কেন? কী হয়েছে তোমার? রাগ করেছ? রাগের মতো তো কিছু ঘটেনি। মন খারাপ করেছে?

সুভদ্রা সাড়া দিল না। অর্জুন নিজের মনে আরও বললো, কী করবে বল? মনের ওপর কারো হাত নেই। তার ভালো থাকা, না থাকা তারই মর্জি।

পরিচালিকার নাম ধরে সুভদ্রা বলল, আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও।

দীপের আলোয় ঘর উজ্জ্বল হল। এবার অর্জুন সুভদ্রার খুব ঘন হয়ে দাঁড়াল। বলল, এখন তোমার মনে কিসের পালা চলেছে? সুখ, না দুঃখের; আনন্দের না বিষাদের? না সব মিলিয়ে একটা বোবা আচ্ছন্নভাব্ তোমাকে ব্যাকুল করেছে। সত্যি কিছু ভাবছ?

দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে জানলার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সুভদ্রা যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে মুখ না তুলে বলল, তুমি বড় জ্বালাও। আমার মতো একটু থাকতে দাও।

অর্জুন সুভদ্রার পাশে এসে বসল। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে গর্বে ভরে উঠল বুক। ভারি সুন্দরী বউ তার। দৈহিক সৌন্দর্যেরও এক বিশেষ আবেদন আছে। সে সৌন্দর্য বুদ্ধি বা গুণমণ্ডিত না হলেও তার প্রতি মনের একটা টান আছে। হঠাৎই তার মনটা বিচার করতে বসল সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর মধ্যে কে বেশি সুন্দরী? দ্রৌপদীর কথা আলাদা। যা কিছু উপাদান দিয়ে সৌন্দর্যের বোধ গড়ে ওঠে, দ্রৌপদীর মধ্যে তার সবকিছু ভরে উপচে গেছে। সুভদ্রার সৌন্দর্য রূপের সৌন্দর্য, গুণের সৌন্দর্য—মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তাতে চোখের পাতা কেঁপে যায়। মুখের ভাব পাল্টে যায়।

অর্জুনের ভাবান্তর সুভদ্রার দৃষ্টি এড়াল না। বেশ বুঝতে পারল, কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোনো নারীর মুখ মনে পড়েছিল তার। সে নারী কে? দ্রৌপদী? উলুপী, না চিত্রাঙ্গদা। এদের মধ্যে উলুপীর মুখ বেশি করে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ সে হল অর্জুনের জীবনে প্রথম নারী, যার শরীরের ঘ্রাণে দেহ মন ভরে ছিল তার। উলুপীর মতো সজীব প্রাণবন্ত নারীর মধ্যে মুগ্ধ করার অনেক কিছু পেয়েছিল অর্জুন। তার মধ্যে মেকী ব্যাপার ছিল না, ভণ্ডামি ছিল না। তার আবেগ, অনুরাগ, উদ্দাম ভালোবাসা প্রাণের ও জীবনের প্রতীক। পুরুষের কাছে তার স্মৃতি কোনোদিন পুরনো হয় না। তাই তার সুন্দর মুখে এক আশ্চর্য প্রসন্নতা মাখা ছবি

ফুটে ওঠেছিল সেই সঙ্গে অস্ফুট চাপা, গোপন কামভাব চোখের তারায় দেখতে পাচ্ছিল। ওর দু'চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, জীবনে প্রথম নারী সংসর্গ কী ভোলা যায়? ভুলে থাকাটা বড় কষ্ট গো।

চমকাল অর্জুন। কিছু না ভেবেই বলল, প্রকৃত ভালোবাসা বড় নগ্ন, বড় ঝড় ঝাপ্টার। তবু নারীপুরুষ একে অন্যজনের কাছে প্রত্যাশা করে বেশি। পুরুষ মানুষ হল বাঘের জাত। প্রেমের বেদনা বিলাস তাকে মানায় না।

সুভদ্রা বলল, তাই বুঝি। তুমি যে উলুপীর স্বামী এ নিয়ে কোনোদিন গর্ব করার মতো কিছু দিলে না তাকে এ জীবনে। স্বামী হিসেবে তার পাশে থেকে জানতে দিলে না, এ পৃথিবীতে সে একা নয়। তার জীবনে তুমি এখনও আছ, ভীষণভাবে আছ। তোমার বুকের মধ্যে যে, তার অস্তিত্বের শিকড় গেড়ে বসে আছে হতভাগীর তা জানা হল না।

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, আমাদের মধ্যে তুমি উলুপীকে টেনে আনছ কেন? আমি তার ভালোবাসা ভালোবাসার খেলার পুতুল ছিলাম। একরাতেই সেই পুতুলের আকর্ষণ ফুরিয়ে গেল। একরাতেই তার জীবনে পুরনো হয়ে গেলাম। আমার আর কোনো দাম রইল না। ওর কথা মনে হলে কী মনে হয় জানো? ওর সত্তার মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যেই ওর প্রাণের মুক্তি নিহিত। তাই ওর চেয়েও ওর প্রেমের কষ্ট অনেক। প্রেমের কোনো ধারণাই নেই বলে ওকে ভালোবাসা হয়নি। অন্তত যাচাই করে দেখার অবকাশ হয়নি।

ভাসা ভাসা দু'চোখে সুভদ্রার দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা। বলল, তুমি আমাকে লুকোচ্ছ।

স্মিত হেসে অর্জুন বলল, এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া অন্য কোনো নারীর মুখ আমার মনে পড়ে না।

সুভদ্রা বলল, তোমার চোখ মুখ কিন্তু সেকথা বলে না। একটা কিছু ভাবছিলে তো।

অর্জুন মাথা নামিয়ে এনে সুভদ্রার কাঁধে মুখ রাখল। গায়ের সুগন্ধে তার চোখ বুজে এল। মনে হল এভাবে তার কাঁধে মুখ রেখে অনন্তকাল চুপ করে থাকার আনন্দটা অনেক গভীর। বলল, ভাবছিলাম। সারাদিন ধরে বুকে যত কথা জমেছে তা বলার জন্য বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছে। কিন্তু শুরুটা করি কী করে?

গুড়গুড় করে সুভদ্রার বুকের মধ্যে যেন মেঘ ডেকে উঠল। একটা অদ্ভুত শিহরন খেলে গেল সারা শরীরে। বলল, আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। বাইরে চাঁদের আলোর খুশি গায়ে মেখে চলো বেড়াতে যাই।

অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল সুভদ্রার সামনে। পাশে ঘন হয়ে বসল। সুভদ্রা চোখ সরিয়ে

নিয়ে বলল, তুমি একটুও ভালোবাস না। তাই অন্যকোনো মতলব করে আমাকে ভোলাতে চাইছ। তোমার এসব নাটক আমার ভালো লাগে না।

অর্জুন জবাব দিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল। অর্জুন বেশ বুঝতে পারছিল তার বুকের মধ্যে দীর্ঘ অদর্শনের ফলে যেসব কথা জমে ছিল তা যেন শীতল, প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। শুধু বলল, তোমাকে দেখতে ভালো লাগে। এও একধরনের ভালোবাসা।

সুভদ্রার উদাস উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি অর্জুনের শরীর ভেদ করে বাইরের চন্দ্রালোকিত রৈবতকের পাহাড়-চূড়ার দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। বলল, সব ভালোবাসা কিন্তু ভালোবাসা নয়। নকল ভালোবাসাও থাকে।

সবিস্ময়ে অর্জুন জিগ্যেস করল, আছে বুঝি?

সুভদ্রার আজ কী হয়েছে সে নিজেও জানে না। অর্জুনের হাতখানা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আছে বৈকি। তোমার তো না জানার কথা নয়। বলতে গিয়ে সুভদ্রার গলা বুজে এল।

অর্জুন আক্ষেপ করে বলল, কেন যে মানুষ ভালোবাসে? ভালোবাসায় এত কষ্ট, এত রক্তক্ষরণ হয় জেনেও নির্বোধের মতো মানুষ ভালোবাসে।

সুভদ্রা জানলার কাছে সরে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখের ওপর। আর তার ছায়া পড়েছে মেঝেতে।

কাকুতিভরা দ্বিধাগ্রস্ত গলায় অর্জুন বলল, তুমি কি শুধু ঝগড়া করবে? সব মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন এমন মন খারাপ করা মুহূর্ত তৈরি হয় যখন কিছু ভালো লাগে না। জোর করে ভালো লাগানোও যায় না। এ হল সেই মুহূর্ত, যখন আসল আমি, সর্বস্ব সম্বল নিয়ে নকল আমির মুখোমুখি করে নিজেকে। জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর তখন তাকে একা একা দিতে হয় নিজেকে। সেই বড় কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে কোনো কিছু ভালো লাগে না। যে কোনো কারণে তোমার মনটা ভালো নেই। তোমার সব বিরোধ আমাকে নিয়ে। ভালো ভালো কথার বোঝা চাপিয়ে তোমার মনকে আর্ত করব না। নিজের এই অবস্থাটা থেকে মুক্ত হতে সময় লাগে। দুর্ভাগ্যের কথা, মুক্তি চাইতে গিয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনে নিজেকে নিজে জড়াচ্ছ। আমি আসছি—বলে সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রার বুকটা হাহাকার করে উঠল। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী এবং দোষী বোধ হল। মনে হল এক লহমায় তার কত কী খোয়া গেল এ জীবনে। এক গভীর হতাশার সঙ্গে মিশে গেল এক তীব্র বিষাদ।

অর্জুন চলে যেতে ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। নিজেকে জিগ্যেস করল : মনটা তার কেন এত এলোমেলো হলো? অর্জুন তাকে কী ভাবল? সপত্নীগত ঈর্ষা হয়তো তার মনকে আর্ত করেছে, তাই এইরূপ অসহযোগিতা। কিন্তু তা যে একেবারে সত্য নয় সে কথা তাকে বোঝায় কী করে? মেয়ে মানুষের মন তো, বড় খেয়ালী আর ভাবপ্রবণ। কখন কী করে বসে নিজের পুরো বোঝে এমন নয়। এই অদ্ভুত ভাবাবেগের জন্য পুরুষদের ভুল বোঝা কোনা দোষের নয়। এভাবে অর্জুনের চলে যাওয়ার জন্য তার খুব কান্না পেল। কাঁদতে পারলে একটু হালকা হত, কিন্তু চোখের জল শুকিয়ে গেছিল। তাই এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না। জ্বালাভরা চোখ নিয়ে এক গভীর অপরাধবোধে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। আর তাতেই ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোল। রক্তের লবণাক্ত স্বাদ পেয়ে সে কেমন নেতিয়ে গেল। বারংবার মনে হতে লাগল, অর্জুনের কোনো দোষ নেই। তবু তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। অর্জুন তো সাধারণ পুরুষ নয়। বংশ গরিমায় তার নিজের চেয়েও গরীয়ান। মান-মর্যাদায় যাদব পরিবারকে ছাপিয়ে গেছে। এমন বর পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অর্জুন তো প্রেমে পাগল হয়ে বীর্যবলে তাকে জয় করেছে। নারীর যে ভালোবাসা পুরুষ কাঙালের মতো ভিক্ষে করে পায়, অর্জুন তেমন ভিখারি নয়। কোনোদিন হাত পেতে সে ভিক্ষে করবে না তার ভালোবাসা মরে গেলেও না।

এখন কী করবে ভেবে পেল না সুভদ্রা। অর্জুনের জন্য মনটা ভীষণ আকুল হল। সত্যিই তার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয় সে। তার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণেই অর্জুন লজ্জায় কক্ষত্যাগ করেছিল। অথচ মানুষটা বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে তার কাছে দৌড়ে এসেছিল নিজেকে ভারশূন্য করবে বলে। আর সে তীব্র অভিমানে না বুঝে ফিরিয়ে দিল তাকে। দুটো প্রেমের কথাও বলল না। নিজেকে শুধু শুধু ছোট করল। মনের বীণার তার ঢিলে হয়ে গেলে তা বাজে কী করে? দোষীর মতো মুখ নিচু করে ছিল সুভদ্রা।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে অর্জুন ফিরে এল সুভদ্রার ঘরে। প্রায়ান্ধকার ঘরে কান্না আর অনুশোচনার মাঝামাঝি এক ধরনের অনুভূতি নিয়ে সুভদ্রা মাথা নিচু করে বসেছিল। অর্জুনের নিঃশব্দ প্রবেশ টের পেল না। কানের কাছে মুখ নামিয়ে অর্জুন বাতাসের স্বরে বলল, আমি ফিরে এসেছি সুভদ্রা। তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব? কে আছে আমার। এখন হল আমাদের পরস্পরকে চেনার সময়। হৃদয় দিয়ে বোঝার মুহূর্তটা অপচয় করতে আছে? মনের তো কোনো দর্পণ নেই যা দিয়ে তোমার ভেতরটা আমাকে দেখাতে পারো। সুভদ্রার গালে গাল ছুঁয়ে সপ্রেমে কথাগুলো বলল।

চোখ ভরে জল এল সুভদ্রার। দেহটা ঈষৎ পিছনে হেলিয়ে অর্জুনের বুকের ওপর মাথা রাখল। অনুতাপিত গলায় বলল, তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে? সত্যি আমার যে কী হয়, নিজেও জানি না। কি যে সব কাণ্ড করলাম একের পর এক মাথামুণ্ড নেই কিছুরই।

অর্জুন তাকে নিবিড় বাহুবন্ধনে বাঁধল। নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করল, চুমু দিল। বলল, পাগলী আমার। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আমরা নতুন বর-বৌ। আমাদের ভীষণ ভাব আর ভালোবাসা।

সুভদ্রার চোখের কোণে নীরব হাসি ঝিলিক মেরে গেল। বলল, বড় কষ্ট গো ভালোবাসায়। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার নাভিমূল থকে কথাগুলো উৎসাহিত হল।

স্মিত হেসে অর্জুন বলল, তাই তো প্রেম এত মধুর। এত সুন্দর।

দ্বাদশবর্ষ বনবাস সমাপ্ত হতে এখনও ছয়টা বসন্ত ঋতু পার করতে হবে। বনবাসের মধ্যভাগে এসে একবার পিছন ফিরে তাকানোর সাধ হল অর্জুনের। বনবাসে জীবনযাপন করা ছিল নিছক কথার কথা। বনবাসীদের অতিথি হয়ে ছ'টা বছর কাটিয়েছে। কিন্তু জীবনের যে ছয়-ছয়টা বসন্ত ঋতু ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে কাটাল তার কোনো খবরই রাখল না কেউ। এমন কি জননী হয়েও কুন্তী তার সম্পর্কে উদাসীন রইল। অগ্রজ যুধিষ্ঠির কিংবা অন্য পাণ্ডব ভ্রাতারা ভুলেও তার খোঁজ করেনি। বলতে কি দ্রৌপদীও তার ব্যাপারে নীরব। তাই গভীর অভিমানে বুকটা ফালা ফালা হয়ে যায়। সেজন্য তার ভেতরটা যে কুঁই কুঁই করে কাঁদে অর্জুনের বাক্যে তা গোপন রইল না। বলল, চোখের আড়ালে গেলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা দূরের হয়ে যায়। যত দিন যায় ততই ফিকে হয়। মানুষ বড় স্বার্থপর আর বিবেকহীন। সত্যি বলতে, আমার একমাত্র পিছুটান ছিল দ্রৌপদী।

সুভদ্রা অর্জুনের মনের কষ্টটা অনুভব করে। অর্জুন যে শান্তিতে নেই তার অস্থিরতা দেখেই বুঝল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, মানুষের আছে শুধু অতীত আর বর্তমান। অতীতের কথা যত ভুলে যাবে তত কষ্ট কম পাবে। অতীত মানুষকে কিছু দিতে পারে না। শুধু কষ্ট দেয়। বিস্মৃতি হলো ভগবানের আশীর্বাদ। যারা ভুলে থাকে তারাই শান্তিতে আছে।

অর্জুন বলল, তুমি যা বললে তার কোনো জবাব নেই। আমি নিজের কাছেই একটি মৃত গাছ। শুকনো মাটির ওপর কঙ্কালসার ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শিকড়গুলো মনের মাটিতে শুকিয়ে গেছে। শিকড়ের গোড়ার মাটি আলগা হয়ে

গেছে। শিকড়ে যার জোর নেই, তার কিছুই নেই। শিকড়সমেত যে কোনোদিন মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে। তারপর জ্বালানি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সমবেদনায় আর্দ্র হল সুভদ্রার কণ্ঠস্বর। বলল, তুমি তো অনেক জেনে ফেলেছ। তবু জেনেও অবুঝ হও কেন? আমি তো জানতে চাইনি। তবু মনের বোঝা হালকা করার জন্য একজনকে তো চাই। তাই না? সব ব্যথা সবাইকে বোঝানোও যায় না। আত্মীয় পরিজনহীনতার কারণে যখন বড় একা লাগে, মনটা বড় বেশি নিরাশ্রয়বোধে কাতর হয় তখন জলে পড়ে আছ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি তো সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি। তবু, এত কষ্ট পাও কেন?

তোমাকে পেয়েই তো জীবনের না পাওয়া দিকগুলো গভীর করে টের পাই। তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। তাই তো প্রাণপণে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে চাই। দ্বারকা ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। নির্বাসনের বাকি ছ'টা বছর দ্বারকায় থাকব। বহু ঠকে শিখেছি, অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার নাম জীবন ধর্ম। সারা জীবন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে দৌড়তে হয় একা একা। দৌড়ে যে প্রথম হয়, সে একাই সকলের আগে থাকে। তার সামনে বা পাশে কেউই থাকে না। জীবন দৌড়েও এটাই নিয়ম।

সুভদ্রা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এই বোধ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতার কথা সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজবদ্ধ মানুষ কখনও ভাবেনি। তোমার জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় অরণ্যে কেটেছে। সেখানে কিন্তু সকলে মিলেমিশে একত্রে থাকে। প্রতিমুহূর্ত নিজের আহার, বিহার, বাসস্থানের জন্য তাদের লড়াই করতে হয়। তবু কোথাও আদৌ সংকীর্ণ স্বার্থপরতা নেই। সে জীবন মুক্ত এবং স্বাধীন। সংগ্রামের এবং দুঃসাহসের। তোমরাও অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় স্নেহ, প্রেম, সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে বড় হয়েছ। এসব কথা তোমার কাছে নতুন নয়। তবু ক্রোধের বশে এবং অভিমানে আচমকা যে কথাগুলো বললে সে যে তোমার মনের কথা নয় আমি জানি।

সহসা অর্জুনের কথা হারিয়ে যায়। খোলা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে সে একটা লম্বা শ্বাস নিল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণবায়ু ছড়িয়ে গেল যেন। মনে হলো, মুক্তি, তৃপ্তি ও সুখে বুকের ভেতরটা ভরে গেল। সব বিষাদ ছাপিয়ে মনটাও অনেক অনেক বড় হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে সুভদ্রার দিকে ফিরে বলল, এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি। অনেক রাত জাগার জন্য তৈরি করতে হবে নিজেকে। তবু, সে সম্পর্কে তুমি চিন্তা ভাবনা কোরো না। তোমার কৌতূহল নেই বলে নিজের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এরকম সুন্দর অনুযোগহীন অবস্থাতে অবশ্য

সুখ দুঃখ মান-অপমান কোনো বোধেরই কাতরতা থাকে না। শূন্য মনে থাকে না কোনো ভাবনা। কিন্তু তবু মনের মধ্যে উলূপী, দ্রৌপদীকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোমার মনে আলোড়িত হয়। অতীত ও বর্তমান জুড়ে মনের ভেতর চলেছে নানা সংশয়। তুমি না বললেও আমি টের পাই। মন্দিরে দেবতার পদতলে উপুড় হয়ে কাতর গলায় প্রার্থনা করেছ, হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও। স্বামীর কাছে আমার প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে সবার মধ্যে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দিও। আমার বিশ্বাসের ধ্রুবতারার জ্যোতি নিভিয়ে দিও না। ইন্দ্রপ্রস্থে আমাকে জিতিয়ে দিও।

অপ্রস্তুতের মতো হাসল সুভদ্রা। বলল, এশুধু আমার একার নয়—সব মেয়েরই প্রার্থনা। সমাজ তো মেয়েদের নিজের মতো করে থাকতে দিল না, তারা পরগাছার মতো অন্য একটা অজানা অচেনা সংসারের সঙ্গে ঝুলে রইল। তাদের নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র নেই, পরিচিতি নেই, স্বামীর পরিচয়েই তার পরিচয়। সব নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্য এক পরিবারের সঙ্গে তাদের মিশে যেতে হয়। কিন্তু উলূপী, চিত্রাঙ্গদাকে এ জীবনে কিছু হারাতে হলো না। তাদের সমাজে নারীও যে মানুষ তারও একটা মর্যাদা আছে, সে যে পুরুষের খেলার পুতুল নয় এই সত্যটাকে অনুভব করেছিল। তাই তাদের কাউকে নিজের ঘর, নিজের দেশ ছেড়ে আসতে হয় না স্বামী গৃহে। পুরুষের পরিচয়ে নয়, নিজের পরিচয়ে পুত্রদের মানুষ করছে। পুরুষ ছাড়াই মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সাহস দেখিয়েছে। দুঃখের কথা চরিত্রের এই জোরটা পুরুষের কৃপা ও অনুগ্রহে ধন্য হওয়ার মহিমার তলায় চাপা পড়ে রইল। ব্যক্তিত্বের জোরে, মনের সাহসে, সংগ্রামের শক্তিতে প্রবল আত্মবিশ্বাসে মেয়ে মানুষও যে পুরুষের সমান হতে পারে চিত্রাঙ্গদা নিজের জীবনে করে দেখিয়েছে। কিন্তু সে মর্যাদা আমাদের এ জীবনে পাওয়া হল না। ফলে, মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা হলো না আর। কিন্তু উলূপী, চিত্রাঙ্গদা আত্মমর্যাদা নিয়ে আমার শ্রদ্ধা কুড়োল। এজন্য তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তারা আমার ভালো বন্ধু।

সুভদ্রার কথায় অর্জুন ম্লান হাসল। বলল, একটা দুর্ভাবনার অবসান হল। তোমায় যে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাব সেখানে বড় ভাবনা দ্রৌপদীকে নিয়ে। দ্রৌপদীর ভালোবাসায় যত আঘাত লাগবে, তার থেকে অনেক বেশি লাগবে তার প্রেমের অহংকারে এবং আমার ওপর তার অধিকার চেতনায়।

সুভদ্রা বলল, দ্রৌপদীর বাস্তব জ্ঞান তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে বোধ হয়েছে, যে তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তাকে নিয়ে অনুশোচনা করা যায় কিন্তু তার ওপর কোনো

কর্তৃত্ব খাটে না। যে জিনিসটা বাঁধা ছিল, সেটা আরো শক্ত করে বাঁধার জন্য যদি বাঁধনের ওপর নতুন করে আরো একটা বাঁধন দিলে আগের বাঁধনটা ঢিলে হয়ে যায়। সুভদ্রার নতুন প্রেমের বাঁধনে অর্জুনের পুরনো প্রেমের বাঁধনও তেমনি আলগা হয়ে যাবে। তাই বড়র গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমাকে আপন করে নিতে হবে।

অর্জুন সোল্লাসে বলল, খুব ভালো হয় তাহলে। এই মহিলার সব দুর্ভাগ্যের মূল আমি। তাকে এ জীবনে এক দিনের জন্য শান্তি দিতে পারিনি। কত অসম্মান সহ্য করে একই সঙ্গে স্বামীর অগ্রজ ও অনুজদের সঙ্গে সহবাস করতে হয়। যদি আমার বিজয়লব্ধা না হত তাহলে এই লাঞ্ছনা অপমান তাকে ভোগ করতে হত না। কর্ণকে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে দেওয়া হল না। দিলে দ্রৌপদীকে এ অপমান ভোগ করতে হত না। সে তার একার ভার্যা হত। দ্রৌপদীকে ভুলে গেছি, কিন্তু তার আত্মগ্লানিকে ভুলতে পারিনি।

একজন মেয়েমানুষের মন নিয়ে আমি দ্রৌপদীর দাবি ও অধিকারকে অনুভব করতে পারি। তুমি অন্য রমণীর হও এটা সে সহ্য করতে পারে না। তোমাকে এত বেশি চায় বলেই তার খুব ইচ্ছে তোমাকে হুকুম করবে, শাসন করবে, দাবি করবে, যখন খুশি রাগ করবে, অভিমান করবে, ঝগড়া করবে, আবার যখন খুব দুঃখ হবে তোমার বুকে দুম দুম করে কিল, চড় মারবে, আবার হেসে-কেঁদে তোমার বুকেই লুটিয়ে পড়বে, ক্ষমা চাইবে, করুণা ভিক্ষে করবে। কিন্তু বিয়ের প্রথম বারো বছরের মধ্যে তার সে সাধ অপূর্ণ রইল। তার সেই সাধের জায়গায় অন্য রমণী ভাগ বসালে কিংবা দখল নিলে তার নিজের বলে কিছু থাকে না। মেয়ে হয়ে তার মনের এই খবরটুকু যদি না রাখি তাহলে মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?

অর্জুন অবাক হয়ে সুভদ্রার দিকে তাকাল। বিস্ময় ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে বলল, সুভদ্রা, তুমি এত মহৎ! আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আনন্দে ভরে গেছে। যা দেখার নয়, ভাবার নয়, কিংবা যা কখনও কল্পনা করেনি তাই দু'হাত ভরে দিয়ে আমাকে ধন্য করলে। গর্বিত করলে। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। উলুপী, চিত্রাঙ্গদা কিংবা দ্রৌপদীও আমাকে এত বড় হৃদয় সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য দিয়ে ধনী করেনি। তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

অর্জুনের বুকের গভীর থেকে উৎসারিত কৃতজ্ঞতাবোধে সুভদ্রা এক মুগ্ধ চমকে চমকে তাকাল তার দিকে। মুখে চোখে তাঁর উচ্ছল খুশির দীপ্তি ফুটে বেরোল। সেই খুশির সঙ্গে একটা মুক্তির সুখ মিলে ছিল। নিজের দুর্ভাবনার কথা অর্জুন না বললেও সুভদ্রা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল কোথায় তার বাঁধা, কতরকমের অসুবিধা তাকে সংকুচিত করে রেখেছিল, সুভদ্রা মন দিয়ে তা জেনেছিল।

দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের আবেগের পাত্র অনেকদিন আগেই শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু দয়া, মায়া মমতার মতো জন্মগত মোহগুলি তো সহজে কাটে না। সেই মায়ার দড়ি ধরে অর্জুনের চিত্ত দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছে যায়। বুকটার মধ্যে কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব হয়। অর্জুন নিষ্ঠুর, বিবেকহীন নয় বলে দ্রৌপদীর জন্য তাকে ভাবতে হয়। দ্রৌপদীও বড় অভিমানী। অর্জুন স্বামী হওয়ার জন্য একটা অহঙ্কার আছে। সে অহঙ্কারে প্রেম যতখানি তার চেয়েও বেশি স্ত্রীর অহঙ্কার। কিন্তু তার ওপর স্ত্রীর দাবি আরও কয়েকজনের আছে। তাই মনের মন্দিরের বাইরে বসে তাকে হত্যে দিতে হয়। এই পরাজয়ের উৎকণ্ঠায় দ্রৌপদীর মন ভালো নেই।

দ্রৌপদীর জীবনে সুভদ্রাই শুধু সমস্যা। উলুপী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েটা দ্রৌপদীকে ভাবায়নি। কারণ তাদের কেউ অর্জুনের সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে আসেনি। কিন্তু বনবাসের সময় সীমা ফুরোলে সুভদ্রাকে জীবনসঙ্গিনী করে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরবে। সে আসবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবধূ হয়ে। অর্জুনের ওপর দ্রৌপদীর অধিকার ও কর্তৃত্বের ভাগ বসাবে। তার কাছ থেকে অর্জুনকে কেড়ে নেবে। এই হারনোর ব্যথাকে দ্রৌপদী ভুলে থাকবে কী করে? কয়েক লহমায় কথাগুলো সুভদ্রার মনে উদয় হল। স্বভাবত একটা উদ্বেগে সুভদ্রার মুখের ভাব বদলে গেল। বলল, স্বামী, ইন্দ্রপ্রস্থে ফেরার দিন যত নিকটবর্তী হচ্ছে ততই আমার ভয় করছে। বড় কিছু একটা ঘটবে। তার সব ধাক্কাটা আমাকে একা সামলাতে হবে। দোষটা যেন আমারই।

বুকের ভেতরটা অর্জুনের ধক্ করে উঠল। নিজেকেও তার ভীষণ অসহায় লাগল। অপরাধীর মতো থমথমে গলায় বলল, আমি তো আছি। সব সামলে নেব ঠিক।

সাত

অর্জুনের ব্রহ্মচর্য পালনের সময় কাল শেষ হতে এখনও ছ'বৎসরের বেশি সময় বাকি। এই দীর্ঘ সময়টা বিবাহের অব্যবহিত পরে কোথায় ঘুরে ঘুরে কাটাবে তাই নিয়ে ভাবতে বসল। কার্যত ব্রহ্মচর্যের নিয়ম, অনুশাসন কিছু মানেনি কোনোদিন। সংযত জীবনযাপনও করা হয়নি। তবু ব্রহ্মচর্যের কথাটা ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে তার জীবনযাপনের সঙ্গে ঝুলে রইল। নিজের সঙ্গে নিজের এই নাটক করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যে ছটি বছর ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে আছে তার একটা দিনও জঙ্গলে কাটায়নি। ব্রহ্মচর্যের নামে নারী সংসর্গও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে তা পালন করেনি। নারী সংসর্গ বাদ দিয়ে জীবনের কোনো মানে হয় না। নারীর অমৃতময়

প্রেমই জীবনকে প্রতিমুহূর্তে নবীকৃত করে। নতুন করে প্রাণ দেয়। জীবনবোধটাই নতুন হয়ে ওঠে। সেই রমণীয় নারী সংসর্গ ছেড়ে বেঁচে থাকা নিরর্থক। মুনি, ঋষিদের মতো জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাও মদনশরে জর্জরিত। ব্রহ্মচর্য পালনের নামে নিজের সঙ্গে কোনো মিথ্যে অভিনয়ও করল না অর্জুন। ব্রহ্মচর্য পালনের বাকি দিনগুলো সুভদ্রাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবেনি। যেখানেই থাকুক, সুভদ্রার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করবে। দ্বারকার নিকটবর্তী পুষ্কর তীর্থের মনোরম পরিবেশে তারা বাসস্থান নির্মাণ করে বাস করতে লাগল।

দিনগুলো কোথা দিয়ে হু হু করে কেটে গেল বুঝেই উঠতে পারে না অর্জুন। দিনগুলো ছিল স্বপ্নে মোড়া। দু'জন দু'জনকে ভুজবন্ধনে বেঁধে চিত্রার্পিতের মতো দর্পণের সামনে স্থির হয়ে থাকত। ইচ্ছে করত না আসক্তির আনন্দঘন আশ্লেষ থেকে মুক্ত হতে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় সুভদ্রার। অর্জুন তার সঙ্গে আছে, সব সময় আছে তার সব আমিত্বের মধ্যে এত গভীর করে ছেয়ে আছে যে তাকে ছাড়া সুভদ্রা বাঁচবে না। তাই তো বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ অর্জুনকে হারানোর ভয় তার। ইন্দ্রপ্রস্থের কথা মনে হলে এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা ঈর্ষা, ওকে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন সে যন্ত্রণা দুর্বল করে দেয় তাকে। ইন্দ্রপ্রস্থে ফেরার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ভয়টা তার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে করে দিল। ভয় ভাঙানোর জন্য অর্জুন তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। মুখে তার একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। বিপুল সোহাগে অর্জুন সিক্ত ওষ্ঠ দিয়ে তার সবটুকু লেহন করে ভরে উঠতে লগল।

সুভদ্রা মেয়েটা বড় ভালো। ভারী সোজা, সরল। শিশুর মতো। ওরকম নরম মনের গভীর সহানুভূতিশীল মেয়ে খুব কম হয়। এমন কি মনের কথা গোপন করতে জানে না। ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়ার আগেই দ্রৌপদী সম্পর্কে বেশ কিছু দুর্বলতা ওর মনে বাসা বেঁধেছিল। দ্রৌপদীর কাছে সে শুধু সতীন। তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার চোখের বালি। মন থেকে কিছুতে মেনে নেবে না তাকে। সেও চায় না তার অনুকম্পা, সমবেদনা। সংকটের শুরু এখান থেকে। তাই যাত্রার দিন যত নিকটবর্তী হয় ততই নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো মাথার মধ্যে ভিড় করে। তাকে বিমর্ষ দেখে অর্জুন জিগ্যেস করল, আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? রোজই মুখ ভার করে মন খারাপ করে বসে থাক কেন?

উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে সুভদ্রা বলল, সব কথা, সব জায়গায় কি বলা যায়? বলতে পারলে একটু স্বস্তি পেতাম। কিন্তু তুমি কীভাবে নেবে, সেটা ভেবেই সংকুচিত হচ্ছি।

অর্জুন আশ্বাস দিয়ে বলল, তুমি অসংকোচে বলো।

তবু সুভদ্রার দ্বিধা যায় না। আমতা আমতা করে বলল, সত্যি বলছ? কিচ্ছু মনে করবে না?

বললাম তো।

তুমি বলছ, কিন্তু আমি পারছি কৈ। ছোট মুখে অপ্রিয় সত্য কথা শুনতে ভালো লাগবে তোমার?

বলে দ্যাখো।

মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যদি উল্টোটা হতো তাহলে কী ঘটত?

মানে?

লক্ষ্যভেদে তুমি না জিতে যদি ধর্মরাজ সফল হতেন তাহলে দ্রৌপদী কি পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী হতো। কিংবা মধ্যম পাণ্ডব যদি বিজেতা হতেন তাহলে কি দ্রৌপদীকে ভাগাভাগির দাবি উঠত?

অর্জুন খুব শান্তভাবে বলল, হঠাৎ এসব অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হল কেন?

নিজের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে তুমি এত নির্লিপ্ত ও উদাসীন বলেই দ্রৌপদীকে এত হেনস্তা ভোগ করতে হল। আমার তো মনে হয় উলুপী, চিত্রাঙ্গদা দুর্বিপাকের ভয়ে তোমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়নি।

অর্জুন নিরুত্তর। ধর্মরাজ তোমার জ্যেষ্ঠ, আমারও অগ্রজ। তাঁকে, অশ্রদ্ধা করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তবে অনুজভ্রাতার জয়লব্ধা ভার্যাকে নিজের পত্নী করার যে নাটক করল এবং ভাগ বাঁটোয়ারা করার যে যুক্তি দেখাল তা আমার মত শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর কপালে যে পুনর্বার ঘটবে না-কে বলতে পারে? সেজন্য ইন্দ্রপ্রস্থে ফেরার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ভয় আমার বাড়ছে।

অর্জুন বলল, এ ভয় নিরর্থক। দ্রৌপদী ও তুমি এক নও। পাছে কোনো সমস্যা হয় তাই বিয়ের আগেই তোমার ভ্রাতা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে আমাদের বিয়েটা অনুমোদন করে নিয়েছিল। সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাসের কোনো সমস্যা তোমার হবে না এটা বলতে পারি। তাহলে এত আশঙ্কার কী আছে?

আছে, পুরুষমানুষের বুঝবার নয়। দ্রৌপদীর মতো সতীনের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে বলেই ভাবনা। তোমাদের পরিবারে সে একেশ্বরী। তার কথায় সকলে ওঠবস করে। না করলে অশান্তি। আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে তাকে মানিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা ভীষণ কঠিন। মেয়েমানুষের মন বড় জটিল। জীবনের কোনো কিছুকে তারা সহজ করে পেতে জানে না। জল ঘোলা করে খাওয়ার স্বভাব

তাদের। আমরা কেউ ব্যতিক্রম নই। নির্মল আকাশে কখন কোন মেঘের উদয় হবে দেখে বলা যায় না। সে মেঘ বৃষ্টির, না বর্ষার, না সূর্যকে আবৃত রাখার কৌতুক মেয়েমানুষও জানে না। দ্রৌপদীর মুখ ভার হওয়া মানে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। তার গোঁসা ভাঙানোর জন্য পঞ্চস্বামী কত কী না করে। তার দয়া, করুণা, অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য স্বামীরা যা করে, সপত্নী তা করবে কেন? অথচ, তোমরা গায়ের জোরে এবং ভয় দেখিয়ে অন্য বউদের তার অধীনে একজন বাঁদি করে রাখ। তোমার ভাইদের এই দ্বিচারিতা আমাকে ক্ষুব্ধ করে। নিজেকে ভীষণ অপমানিত এবং অসম্মানিত বোধ হয়। জানি না, এই কার্যে কতটা সফল হব?

তুমি মিথ্যে আশঙ্কা করছ। দ্রৌপদী আমাদের খুব ভালো বউ। সকলকে নিয়ে চলতে জানে।

দ্যাখো, আমি তো মেয়ে। আমি জানি একজন মেয়ে পাঁচজন পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু দু'জন মেয়ে একজায়গায় হলে নিত্য মনোমালিন্য এবং ঠোকাঠুকি লেগে থাকবে। কিছুতেই সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে পারে না। ঈর্ষার আগুন বুকে জ্বালিয়ে নিজে পুড়বে অন্যকেও পুড়িয়ে মারবে। মেয়েমানুষ মিলেমিশে থাকতে শেখেনি। তার নিজের ক্ষুদ্র চাওয়ার সঙ্গেও সে আপোস করে না। যেটুকু পাওনা তার সবটুকু সে একার করে পেতে চায় বলেই গোলমাল বাঁধে। তার সমস্ত চাওয়াটা স্বামী, সন্তান, সংসারের জন্য। এটাই হল তার নিজের জগৎ। এই জগৎই তার স্বর্গ। এখানে সে স্বরাট হয়ে থাকতে চায়। দ্রৌপদীর সমস্যা অন্যত্র। সে তোমায় পাগলের মতো ভালোবাসে। তবু এ জীবনে এখনও তোমাকে স্বামীরূপে পাওয়া হয়নি। দীর্ঘ প্রবাসের পরে তুমি যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরবে, তখন অন্য নারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে সে কিছুতে মেনে নিতে পারবে না। তোমার ওপর অন্য কোনো নারীর দাবি কিংবা অধিকার তার সহ্য হবে না। আমাকে যদি মানতে না পারে দোষ দেব না। রাগও করব না। মেয়ে হয়ে তার মনের মানচিত্রটা আমি জানি। কিন্তু তার সুখের জন্য আমার নিজের ঘর ছাড়ব কেন? জেনে বুঝে আমার ঘরে আগুন লাগাতেই বা দেব কেন? আমাদের উভয়ের সংকট, সমস্যা, সংঘর্ষ এখানে।

অর্জুন মাথা হেঁট করে বলল, তোমার মতো মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে সব বিরূপতাকে সামলাতে পারবে। তুমি কৃষ্ণের মতোই সামান্য কথা দিয়েই মানুষের অন্তরে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারো। প্রত্যেক সম্পর্ককে মধুর করে তাকে এতটুকু বিপর্যস্ত না করে, যথাস্থানে রেখে তার পূর্ণ মূল্য চুকিয়ে দিতে পারো। কৃষ্ণের মতোই মানুষের অন্তরের গভীরতম স্থানে পৌঁছবার আশ্চর্য কৌশল ভগবান

তোমায় দিয়েছে। কেবল তুমিই পারবে দ্রৌপদীর শূন্যতাকে ভরিয়ে দিয়ে তাকে নতুন প্রাণ দিতে।

স্বামী, বঞ্চিত প্রেমের এই পরিণামের মধ্যে সৌন্দর্য কোথাও নেই। সে একজন দগ্ধ মহিলা। তার বুকের ভেতর পোড়ার জ্বলুনি, মুখে জ্বালা-যন্ত্রণার গোঙানি-কী ভয়ানক অবস্থা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

আমি জানি। প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য পুড়ে খাক হয়ে গেলে তার রইল কী? ভালোবাসার জন্য যদি কারো এই পরিণাম হয় তাহলে আমার দুঃখের অন্ত থাকবে না। ভদ্রা, এসব বাইরের ব্যাপার। সুখ, শান্তি, আনন্দ বাইরের কোনো অবস্থায় বা বস্তুতে নেই। অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করে তবেই বাইরের স্পর্শে, আচরণের মাধুর্যে তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে। ভালোবাসায় নতুন করে প্রাণ পায়। দ্রৌপদী যদি বুঝতে পারে, তুমি তাকে শ্রদ্ধা কর, ভালোবাসা, তোমার সপ্রেম ভালোবাসায় যদি তার প্রেমেরও প্রশ্রয় পাওয়ার জায়গা থাকে, যদি বিশ্বাস হয়, তোমার কাছে তার হারানোর কিছু নেই। তুমি তোমার দাবি অধিকার সযত্নে রক্ষা করেও যদি তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে না দাও তাহলে দেখবে দ্রৌপদীর দগ্ধ অন্তঃকরণে ডালপালার নতুন করে কুঁড়ি ধরেছে।

সুভদ্রা কথা বলতে পারে না। অবাক বিস্ময়ে অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভালোবাসার এ কোন আলো-দিয়ে তুমি আমার সামান্য অনুভবকে অসামান্য করে দিলে। বুকের মধ্যে এ কোন আবেগে আমার শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমার সমস্ত মনটা দ্রৌপদীর দিকে টানছে। তোমাকে ভালোবেসে দ্রৌপদীকে শান্তি দেবার জন্য সত্যি কিছু করতে পারি, সে হবে আমার পুজো।

সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রওনা হল অর্জুন। বিয়ের পরে সুভদ্রা যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। তাই কনের বাড়ি থেকে কৃষ্ণ, বলরাম, সত্যভামা, রুক্মিণী, রোহিণীও তার সহযাত্রী হল। শুধু তাই নয়, বিয়ের সময় কনে পক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক দেওয়ার কোনো সুযোগ পায়নি। তাই বরপক্ষের মান মর্যাদার যোগ্য উপঢৌকনও সুভদ্রার সঙ্গে পাঠানো হল। সে এক বিশাল ব্যাপার। দূত মারফত সুভদ্রা অর্জুনের প্রত্যাবর্তন এবং নতুন কুটুম্বদের আগমন সংবাদ ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠানো হল।

সারা পথ অর্জুন সুভদ্রার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বুকের মধ্যে তার সময় লাফাচ্ছিল। সে যে একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগছিল তার চোখে মুখে তা ফুটে উঠেছিল। সুভদ্রা তাকে শুনিয়ে বলল, চারপাশের পৃথিবীটা কী সুন্দর। কী ভালোই

না লাগে। এই আলো, ছায়া, মেঘ, রোদ্দুর, পাখির ডাক, আকাশের নীল, বনের সবুজ, মহিষ কালো পাহাড়—সবই অসাধারণ সুন্দর। এসব ছেড়ে থাকতে একটু ইচ্ছে করে না। অথচ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যিখানে বসেও তুমি কী ভীষণ নীরব। কোনো কিছুতে তোমার মন নেই। হয়তো এসব দেখার মতো তোমার মনের অবস্থা নয়। কিংবা এসব অনুভব করার প্রয়োজন বোধ করছ না। তোমার অনাদরে এবং অবহেলায় তারাও যে মূল্যহীন হয়ে যাবে তাও নয়। আসলে কি জানো, তোমার মতো মুসাফিরের কাছে যা ছিল সবচেয়ে সহজ তার প্রতি মন না থাকার মানে অন্য বড় কিছু তোমার মন অধিকার করে আছে। তাই যাত্রার আনন্দটাই বিস্বাদ বোধ করছ। কিন্তু তুমি আমাকে শিখিয়েছ মানুষ সতত চলমান। দাবার গুটির মতো তাকে কোনো একটা খোপে আজীবন বসিয়ে রাখতে পারো, কিন্তু খেলাটা তাতে মরে যায়। মানুষের মতো ঐ গুটি এক খোপ থেকে আর এক খোপে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ তো সচল জীব। তার পায়ে গতি আছে। স্থান পরিবর্তনের নেশা আছে। এসব সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। এসব থেকে সরে থাকা মানে একটা মনের অভ্যন্তরে বড় কিছু একটা ঘটে যাওয়া।

অর্জুনের একাগ্র দুটি চোখ সুভদ্রার চোখের ওপর নিশ্চল হয়ে রইল। আশ্চর্য এক বিভোর বিহ্বলতায় তার কণ্ঠস্বর ভীষণ গম্ভীর শোনাল। বলল, নীরব এক অদৃশ্য লড়াই তো আমার মনের সঙ্গে লেগে আছে। এই মুহূর্তে সেটা এতই তীব্র যে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। যুদ্ধে সমর কৌশল নির্ণয় করতে আমার সময় লাগে না। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে গৃহযুদ্ধটা কী করে সামলাব তার হরেক রকম ছক আঁকছি মনের ভেতর। রথ থেকে নামতে যতটুকু দেরি। তারপর দ্রৌপদীর মুখোমুখি হতে হবে। ব্যর্থ প্রেমের সব অভিমান নিয়ে সে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করবে অর্জুন তুমিও! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? আমাকে একটুও ভালোবাস না বলে ব্রহ্মচর্যের সংযমে বাঁধোনি নিজেকে। তখন কী জবাব দেব আমি? যুদ্ধে সমরকৌশল স্থির করতে দেরি হয় না একেবারে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে দ্রৌপদীর মুখোমুখি হয়ে তাকে সামাল দেবার মতো কোনো ভালো কথা মনে পড়ছে না। একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের মনে দুঃখ দিতে চাই না বলেই এত কথা ভাবছি। কিন্তু সত্যি আমার দোষ কী বলো? সারাজীবন তার কাছে আমি বা কি পেতাম? সেও কি আমার কম যন্ত্রণা?

সুভদ্রা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বড় দেরি করে এসব কথা মনে করলে। আমাকে বিয়ে করার আগে এসব ভাবলে এত কষ্ট ভোগ করতে হতো না তোমায়। আমার দুঃখ শুধু এই যে, আমার জন্যই তোমাকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে।

এসব উল্টোপাল্টা কথা ভেবে তুমি শুধু নিজের মনটাকে আর্ত করছ। না না, এভাবেই আত্মরক্ষার একটা কৌশল ঠিক বেরিয়ে আসবে।

আশ্চর্য মিশ্র বনজ গন্ধ নিয়ে অর্জুনের রথ ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছল।

রাজপথ জনপথ পত্র পুষ্প মাল্যে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। রাস্তাতে রাস্তাতে বিরাট বিরাট তোরণ নির্মিত হয়েছিল। সর্বত্র খুশির হাওয়া বইছিল। অর্জুনের রথ পৌঁছতে পুর নারীরা শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনি করতে করতে দৌড়ে এল। নববধূ বরণ করতে সকলের পিছন পিছন এল পার্থ-জননী কুন্তী। সুভদ্রার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। যুধিষ্ঠির পত্নী দেবিকার হাত ধরে সুভদ্রা নামল রথ থেকে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল কুন্তীকে। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কৃষ্ণ-ভগিনী নববধূ সুভদ্রাকে আদর করল। চিবুক ছুঁয়ে চুম্বন জানাল। তারপর দেবিকা ও কুন্তী নববধূকে তার ঘরে পৌঁছে দিলে কুন্তী বলল, বিশ্রাম করো। দেবিকা তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে।

সুভদ্রা একটু একা থাকার জন্যই দেবিকাকে বলল, তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু সারা গায়ে পথের ধুলো জমেছে। কাপড়েও ধুলো বালি কিচ কিচ করছে। বাইরের জামা কাপড় ছেড়ে, স্নান করে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গা ঘিন ঘিন করছে। স্নান করে পরিচ্ছন্ন হলেই তাজা ভাব আসবে।

দেবিকাও ওর সমর্থনে বলল, ঠিক বলেছ। হাত পা ধুয়ে স্নান করে গাত্র মার্জনা করে পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। সাজগোজ করলেই একটা তাজা ভাব আসবে। এসব করতেও তোমার সময় লাগবে। এই সময়টা আমিও মুখ বুজে ঘরে বসে কী করব? বরং, এখন যাই, পরে খবর দিলে আসবক্ষণ।

দেবিকা মনে মনে পালাই পালাই করছিল। সুভদ্রাও চাইছিল দেবিকা তার ঘরে ফিরে যাক। সে একা একা বিশ্রাম নেবে আর নিজের মনে একটা ছক কষবে। কিন্তু তাকে কিছু করতে হল না। দেবিকাই স্বেচ্ছায় চলে গেল।

দ্বার রুদ্ধ করে সুভদ্রা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল। মুখটা কালি পড়ে গেছে। নরম কাপড়ে মুখটা মুছতে কালির মতো ময়লা উঠে এল। তারপর নানারকম ভঙ্গি করে নিজেকে দেখল। বার বার দেখল। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার মধ্যে একধরনের আত্মতৃপ্তি আছে। এই তৃপ্তির নাম আত্মপ্রেম। নিজের এই শরীরটাকে সে যে এত গভীর করে ভালোবাসে এর প্রতি তার যে এত তীব্র আসক্তি ইন্দ্রপ্রস্থে নিজের খাস কামরায় বসে প্রথম অনুভব করল।

হঠাৎই আলসেমিতে পেয়ে বসল। পালঙ্কের শুভ্র ফেননিভ কোমল বিছানার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। কিছুতেই তার ভালো লাগল না। ভিতরে ভিতরে এক দুরন্ত অস্থিরতা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। আসলে কী করলে নিজের কূল থেকে দ্রৌপদীর কূলে পৌঁছানো যায় তারই প্রস্তুতি চলছিল মনের ভেতর।

অর্জুন তো ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছেই সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য মনে করল। সুভদ্রার দিকে আড়চোখে তাকাতে সেও নিঃশব্দে অনুমোদন করল। কারণ তিনি শুধু অগ্রজ নন, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাও বটে। একসাথে রাজা ও অভিভাবক। দীর্ঘ প্রবাসের পরে সে যে প্রত্যাবর্তন করেছে তার আগমন বার্তাটা সর্বাগ্রে তাঁকে দেওয়া কর্তব্য। অন্যকে দিয়ে সে কাজ করতে পারত, কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনে যুধিষ্ঠির কতটা খুশি কিংবা তাঁর প্রতিক্রিয়া বা কিরূপ হয় স্বচক্ষে অনুধাবন করতে পারবে।

অর্জুনের বিলম্ব হওয়ার জন্য সুভদ্রা একটু চিন্তিত হল। দ্রৌপদীকে যে একবার চোখের দেখা দিয়ে আসবে অর্জুন সুভদ্রা তা জানে। তাকে একবার চোখের দেখা দেখলেই তার সব রাগ অভিমান জল হয়ে যাবে। অর্জুনের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া মানে দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কটা ফিকে হয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই বাস্তব সত্যটা দ্রৌপদী জেনেও যাতে মনে ক্ষোভ না রাখে সেটা সুভদ্রারও দেখা কর্তব্য। সপত্নীগত ঈর্ষা বিদ্বেষে পাঞ্চালীর মন একটুও আর্ত না করে দেখাতে হবে তার আগমনে তাদের উভয়ের পূর্ব সম্পর্ক এতটুকু বিপর্যস্ত হয়নি কোথাও। বরং অর্জুনের প্রতি তার অধিকার ও দাবিকে যথাস্থানে রেখে সে তা থেকে যতটুকু পাবার তা গ্রহণ করে তার পূর্ণ মর্যাদা ও গৌরব সযত্নে রক্ষা করবে। দ্রৌপদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নয়, কিংবা সপত্নী হয়ে নয়, সে তার বন্ধু হয়ে, অনুজ ভগিনী হয়ে একান্ত অনুগামী ও একজন সহযোগী হয়ে তার পাশে ছায়ার মতো বিরাজ করবে। অর্জুনের প্রতি তার স্বামীত্বের দাবি কিংবা কর্তৃত্বের অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ রেখে সুভদ্রা দ্রৌপদীর ভগিনী হয়ে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। অর্জুন দীর্ঘদিন ধরে তার মনকে একটু একটু করে তৈরি করেছে। এতে সুভদ্রাকে কিছু হারাতে হবে না। প্রথম ভাবাবেগটা কেটে গেলে দ্রৌপদী নিজেই অর্জুনের জীবন থেকে অনেকদূর সরে যাবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে ছিল সুভদ্রা। অর্জুন ফিরে আসতেই সুভদ্রা দ্রৌপদীর ঘরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। লাল রঙের বেনারসী ছেড়ে বৃন্দাবনের গোপিনীদের প্রিয় হলুদ রঙের ঘাগরা আর সবুজ রঙের কাঁচুলির ওপর একটি ওড়না জড়িয়ে অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর কক্ষে হাজির হলো।

উভয়কে দেখামাত্র এক দারুণ দুঃখ আর অভিমানে দ্রৌপদীর বুকের ভেতর উথলে ওঠার ভাব হল। কত কথা মনে পড়ল। অর্জুন বড় নিষ্ঠুর। নির্দয় হাতে তাকে উপড়ে ফেলার জন্য নববধূকে সঙ্গে করে এনেছে। বুকের ভেতরটা অর্জুনকে চিরতরে হারানোর হাহাকারে হু-হু করে উঠল। সব পাণ্ডবেরাই বিয়ে করেছে। এমনকি যুধিষ্ঠিরও। অসহায়ভাবে মুখ বুজে তাদের নিষ্ঠুরতা সব দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করেছে। তাদের কারো ওপর কোনো অভিযোগ ছিল না। স্বামীদের নিদারুণ বিশ্বাসভঙ্গতায় তার বুক পুড়েছিল। তবু তার মনের খবর কেউ নেয়নি। সুকোমল মনটা প্রত্যেকের অনাদরে, অবহেলায় এবং উপেক্ষায় একটু একটু করে শুকিয়ে গেছিল। যেটুকু সজীবতা ছিল সেটুকু গেল অর্জুনের নিষ্ঠুরতায়। তার নিজের মনের কথা বলার জন্য একজনও থাকল না। সে একা। নাথবতী অনাথবৎ।

এরকম এক দুর্বিষহ মনের অবস্থায় দ্রৌপদী বাকরুদ্ধ। সুভদ্রাকে সমাদর করে কাছে ডেকে নিতে ভুলে গেল। দু'চোখের কোণে তার জল টলটল করছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে, কী করবে ভেবে পেল না। অবশেষে সুভদ্রাই শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল দ্রৌপদীর দিকে। মাথা নত করে পদধূলি নিয়ে বলল, আমি সুভদ্রা। কাছে ডাকবে না, পাশে বসাবে না। তোমাকে দিদি বলে ডাকতে দেবে না। আমি তোমার অত্যন্ত বাধ্য এবং অনুরাগিনী একটি ছোট্ট ভগিনী। আমাকে তুমি বকবে, শাসন করবে, যখন খুশি কাছে ডাকবে, আদেশ করবে, যখন খুব কান্না পাবে আমার কাছে ডাকলে এস, একটু ভালোবেসো তা-হলেই হবে। আমার সব দোষ ত্রুটি, অপরাধ একটু সহ্য করো। আমার জন্য এটুকু করতে পারবে না?

দ্রৌপদী অভিভূত হয়ে গেল। বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালোবাসা। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, এমন করে তুই আমাকে হারিয়ে দিলি বোন। আমার সখা কৃষ্ণের বোনের মতোই কথা। ত্যাগের বৈভবে তোর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দুই সুন্দর। তোর বড় মনের আলো পড়ে আমার ছোট ছোট স্বার্থগুলোও অসামান্য হয়ে উঠল। সখা কৃষ্ণ বলত—সখী ত্যাগে মানুষ সব চেয়ে সুন্দর হয়। বড় ত্যাগের মতো আনন্দ, সুখ আর কিছুতে নেই। শ্রদ্ধা না থাকলে ত্যাগ করা যায় না। প্রকৃত ভালো না বাসলে মনে ত্যাগের ইচ্ছে জাগে না। তাই তুমি অন্য পাণ্ডব মহিষীদের মতো নও। নিজের জন্য পার্থকে চাওনি তুমি। সাধারণ রমণীর মতো নিজের স্বামীকে আগলে রাখারও কোনো কথা বলোনি। তুমি এক অনন্যা নারী। তোমার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা সত্যি আমার আছে কি?

অর্জুনের দিকে তাকাতে আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠল মন। বলল, আমার সব দুঃখের মূল তুমি। লক্ষ্যভেদে সেদিন কর্ণকে বাধা না দিলে আমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারত। পিতা যজ্ঞসেনকে জিতিয়ে দিতে গিয়ে আমার অদৃষ্টের কাছে হেরে গেলাম। আমি এক কপটতার শিকার। তোমার ভাইরা নিজের নিজের সুখ আর তৃপ্তির জন্য আমাকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করল। কিন্তু তাদেরও নিজের কোনো ত্যাগ ছিল না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে এক এক রমণীর পাণিগ্রহণ করল। কেবল আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। আমি যে একটা মানুষ সেটা কেউ বুঝল না। তোমার ভাইরা আমাকে ভালোবাসেনি, আমার রক্তমাংসের দেহটাকে ভালোবেসেছিল। বিয়ের নাম করে এই দেহটাকে আশ মিটিয়ে তারা ভোগ করল। আমি হলাম তাদের দেহ সুরা। সুরা যেমন পাত্র থেকে পাত্রে পরিবেশিত হয়, তেমনি প্রতি বছর আমার এই দেহটা তোমার এক এক ভাই তাদের আরো স্ত্রী থাকা সত্বেও ভাগের ভাগ নেওয়ার জন্য ঈগল পাখির মতো ছোঁ মেরে ভাগাড়ে নিয়ে গিয়ে প্রবল মত্ততায় কিছুমাত্র বাকি না রেখে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে নিঃশেষ করত। মাথা হেঁট করছ কেন পার্থ? তোমার ভীরুতার জন্য, কাপুরুষতার জন্য আমার এই দুরবস্থা। মুখে যে যত আদর্শের কথা বলুক, তোমাদের পরিবারে আমি একজন বারাঙ্গনা ছাড়া কিছু নই। কেউ যদি বেশ্যা বলে কোনোদিন গালি দেয় তাহলে সেটাকে মিথ্যে বলার বুকের পাটা নেই আমার। তোমাদেরও না। শোনো কৃষ্ণ ভগিনী, পাণ্ডবেরা সবাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেউ আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দেয়নি। তাদের মতো হয়ে তাদের সুখের জন্য তৃপ্তির জন্য হারেমের বাঁদীর মতো আমাকে বাঁচতে হচ্ছে এখনও। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই দাসত্ব চলবে। তাদের অনাদরে অবহেলায় আমার বুকে যে তাপ জমেছে তার জ্বালায় জ্বলছি অহরহ। আমার সব দুঃখ কষ্ট জল করে দিলে তুমি। উভয়ে সুখী হও তোমরা।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রৌপদী অশ্রু গোপন করল। অর্জুন ওর কাঁধে হাত রাখল। সমবেদনার হাত। অমনি দ্রৌপদী ঘুরে দাঁড়াল। অর্জুনের চোখে চোখ রেখে অশ্রুসিক্ত গলায় বলল, স্বামীরা কেউই আমাকে তাদের স্ত্রী বা জীবনসঙ্গিনী ভাবতে পারেনি, দাবিও করেনি। অথচ বাঁচতে গেলে তাদের তো একজন সর্বক্ষণের জীবন সঙ্গিনী চাই। নইলে জীবনটা অর্থহীন, মরুভূমি হয়ে যায়। নারীহীন পুরুষ ছন্নছাড়া। নারীই পুরুষকে দেয় আনন্দ, প্রেম, প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা। তেমনি নারীও কামনায় নিজেকে নিঃশেষ করে পুরুষের প্রাণে প্রেমের প্রদীপ হয়ে জ্বলে। কিন্তু আমার জীবনে প্রেমের সেই পরশ পাথর কোথায়? আমাকে কে কী দিল? বুকভরা শূন্যতা নিয়ে আমি কী করে বাঁচব সে কথা ভাবার একজন পুরুষ নেই।

অর্জুনের বুকের ওপর মাথা রেখে সহসা কান্নায় ভেঙে পড়ল দ্রৌপদী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আজ তোমার ওপরেও আমার কোনো দাবি রইল না। আমি সম্পূর্ণ একা। অথচ একদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে এবং সকলকে বুঝিয়েছিল প্রাকৃতিক জগতে মা হতে যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের জন্ম, যেখানে মেয়েদের কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল পুরুষরা গায়ের জোরে তা কেড়ে নিয়েছিল। আমরা পাঁচ ভাই মিলে নারীকে সেই গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ব। সেদিন তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে তুমি বিয়ে করে অন্যদের পথ দেখালে। আমার জীবন নিয়ে তোমরা সকলে এক অদ্ভুত খেলায় মাতলে। কেন? কী দিয়েছ তোমরা আমাকে? এই বুকটাকে শুধু খালি করে দিয়েছ। শুধুই হারিয়েছি। কিন্তু কার দোষে? এর জবাব তোমাকে দিতে হবে?

দ্রৌপদীর উত্তেজিত স্বর উগ্র থেকে উগ্রতর হল। চোখ দিয়ে তার আগুন বেরোতে লাগল। সুভদ্রা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, দিদি, তোমার কষ্ট দুঃখটা আমি বুঝি। তুমি শুধু রাজমহিষী, কারো প্রণয়িনী নও। সংসারে, পরিবারে তুমি শুধু কর্ত্রী। তোমার যন্ত্রণাময় এই অস্তিত্বের জন্য আমরা সকলে দায়ী। কনিষ্ঠা ভগিনী হয়ে আমি তোমার উষর বুকে মরূদ্যান রচনা করতে পারব। সেই অধিকার দিয়ে আমাকে তুমি ধন্য করে দাও।

সুভদ্রা যে এরকম একটা কিছু ঘটাতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি দ্রৌপদী। এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আমার আর কোনো কষ্ট নেই। তুমি আমার দুঃখের বন্ধু, যন্ত্রণার বন্ধু, আমার সকল একাকিত্বের বন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু—তোমাকে 'না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারি?

আট

সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ের পরে অন্ধক, বৃষ্ণি ও যাদবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের মাখামাখিটা খুব বেড়ে গেল। ইন্দ্রপ্রস্থে আসার কিছুকাল পরে দ্বারকায় সুভদ্রার অভিমন্যু নামে এক পুত্র সন্তান হলো। এর পরেই দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থের মধ্যে বৃষ্ণি ও পাণ্ডবদের যাওয়া আসাটা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পিতৃকুলে অভিমন্যুর সার্বিক প্রিয়ত্ব যতখানি অর্জুনপুত্র হওয়ার জন্য তার চেয়ে বহুগুণ বেশি হল বৃষ্ণি কন্যা জননী সুভদ্রা ও তার মাতুল কৃষ্ণের জন্য।

সুভদ্রাকে কৃষ্ণ প্রাণাধিক ভালোবাসত বলেই অভিমন্যু তার আরো প্রিয় হলো। তাছাড়া এই ভাগিনেয়টি অর্জুনের ঔরসজাত তাই ওর প্রতি আকর্ষণটা আরো

গভীর হলো কৃষ্ণের। বিশেষ এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে সুভদ্রা পুত্রের জন্ম। ভারতের রাজনীতিতে পাণ্ডবেরা যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেই মহেন্দ্রক্ষণে অভিমন্যুর জন্ম।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরেই সে হয়েছিল। কৃষ্ণের মনে হয়েছিল রাজসূয় যজ্ঞের অগ্নিতে যে আগুন ছিল তা প্রদীপিত হয়েই যেন অভিমন্যুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিমন্যুর মধ্যে অগ্নিবৎ তেজ ও বিক্রম সুপ্ত ছিল। তাই ভাগিনেয়র অভিমন্যু নামকরণ করল কৃষ্ণ। অর্থাৎ, যে মহাবীরের বুকে ভয় বলে কিছু লেখা নেই। সে হলো নির্ভীক ক্ষাত্র তেজের স্বরূপ। তাই তাকে নিয়ে কৃষ্ণ অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বুকে বিশেষ আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের ধারণা অভিমন্যুর জন্ম একটা অভ্যুদয়। নইলে, অন্য পাণ্ডবদের পুত্র ছিল। দ্রৌপদীরও পুত্র ছিল। কিন্তু তাদের কাউকে নিয়ে এত আবেগ, উচ্ছ্বাস ছিল না। দ্বারকা থেকে দূতের মুখে অভিমন্যুর জন্মের সুখকর সংবাদ শুনেই মহানন্দে যুধিষ্ঠির মুক্ত হস্তে টাকা-পয়সা রত্ন বিতরণ করতে লাগল। এমন কি ব্রাহ্মণদের গাভী দান করে প্রচুর আনন্দ লাভ করল। কৃষ্ণ বিপুল উচ্ছ্বাসে ভাগিনেয়র নাম দিল অভিমন্যু।

দু-একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও কৃষ্ণের নায়কত্বে রাজসূয় যজ্ঞ মোটামুটিভাবে সুসম্পন্ন হলো বলা চলে। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবেরা যে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না রাজসূয় যজ্ঞেই তা স্থির হয়ে গেছিল। হস্তিনাপুরের জ্ঞাতিশত্রু দুর্যোধনই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে পাণ্ডবদের সুখ শান্তি কেড়ে নেবে। নানারকম রাজনৈতিক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কৃষ্ণ তাই ভাগিনেয়কে এবং ভগিনী সুভদ্রাকে ঐ ক্লিন্ন পরিবেশের মধ্যে রাখতে চাইল না। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তাদের দ্বারকায় আনার সিদ্ধান্ত নিল। ভাগিনেয়কে একেবারে শৈশব থেকে দ্বারকাতে রেখে সবরকম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য সাত্যকি, কৃতবর্মা, বলরাম এবং কৃষ্ণ দায়িত্ব নিল। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে, নানারকম যুদ্ধের রোমহর্ষক গল্প করে বালককে উদ্দীপিত করত। বালকও খেলার ছলে যুদ্ধ করতে আনন্দ পেত। এমন কি অর্জুনও দ্বারকায় যেত পুত্রের শিক্ষার সবিস্তার সংবাদ নিতে। প্রিয় পুত্রকে ধনুর্বিদ্যায় পরম শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার সঙ্গে তীর ছোড়ার খেলায় অংশ নিত। ছবি এঁকে তাকে বোঝাত কোন যুদ্ধের জন্য কোন কৌশল নিতে হয়। অভিমন্যু সব বুঝতো না, কিন্তু ভালো লাগত তার। কৃষ্ণ ওকে গল্প করে বোঝাত কোনো ধরাবাঁধা কৌশল নয়, অবস্থা বুঝে কৌশল বদলাতে হয়। এক এক পরিস্থিতিতে এক এক কৌশল নিয়ে নিজের জয়কে যে নিশ্চিত করতে না জানে তাকে এ জীবনে পস্তাতে হয়। যুদ্ধে জয়ই শেষ কথা। কে কীভাবে যুদ্ধে

জিতল কেউ তা মনে রাখে না। কিন্তু জয়টাকে মনে রাখে। ভাগিনেয়কে এতবড় একটা জটিল বিষয়কে বোঝানোর জন্য একটা গল্প বলল। কেউ গল্প আরম্ভ করলে অভিমন্যু গোল গোল চোখ করে গোটা গল্পটা গিলতে থাকে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কৃষ্ণ বলছিল আর অভিমন্যু তন্ময় হয়ে শুনছিল। গল্প শেষ হয়ে গেলে মাকে গিয়ে সে গল্পটা হুবহু বলল। জানো মা, কৃষ্ণ মামা আজ একটা সুন্দর গল্প বলেছে। জীবন যুদ্ধের গল্প। একটা ক্ষুদ্রতম প্রাণীকে বাঁচার জন্য তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, কৌশল করে বেঁচে থাকতে হয়। লড়াইয়েরও নানারকম মারপ্যাঁচ আছে। প্রত্যেকটি প্যাঁচই আলাদা। বাঘবন্দীর খেলার মতো তারা এক একটা খোপে বাস করে।

সুভদ্রা পুত্রের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বলল, তোমার গল্পে গৌরচন্দ্রিকাটা বেশি। এত বেশি গৌরচন্দ্রিকা করলে গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়। গল্প বলা একটা শিল্প। আমার বোধগম্যের জন্য এত দীর্ঘ ভূমিকা করার প্রয়োজন নেই। আমার তো কাজকর্ম আছে। সে তো আর তুমি করবে না।

অভিমন্যু বলল, একটা বুড়ো বটগাছের তলায় মাটির নীচে গর্ত করে পলিত নামে এক ইঁদুর বাস করত। পাছে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাই চতুর্দিকে গর্ত করে এক গোলকধাঁধা তৈরি করেছিল। ঐ গাছের ডালে লোমশ নামে এক বনবিড়াল এবং হরিত নামে এক কালান্তক কাল পেঁচাও দীর্ঘকাল ধরে বাস করত। চন্দ্রক নামে এক নকুলও আশে পাশে থাকত। কার্যত, পলিতকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতে হতো। একদিন সেখানে পরিখ নামে এক ব্যাধ এল। পলিতকে তাই খুব সাবধানে, চারদিকে চোখ খোলা রেখে বাস করতে হতো। একদিন ঘটল এক অঘটন। পরিখের জালে ধরা পড়ল লোমশ। পাশবন্ধন মুক্ত করতে গিয়ে দড়ির ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল লোমশ। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পলিত সব দেখল। নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পলিত গর্ত থেকে বেরিয়ে মনের সুখে আহার খুঁজতে লাগল। লোমশের খুব নিকটেই একটি হৃষ্টপুষ্ট কীট শিকার করল পলিত। ক্ষুধার্ত লোমশ তা দেখল। পলিতের হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহটির ওপর তার লোভ খুব। কিন্তু কত কাছে তবু লোমশ অসহায়। বরং পলিতই তার পিঠের ওপর চড়ে পরমানন্দে কীটটাকে ভক্ষণ করছিল।

বাতাসে অকস্মাৎ পাখির গায়ের গন্ধ পলিতকে সন্ত্রস্ত করল। অন্ধকারের মধ্যে হরিতের হিংস্র দুটি চোখ জ্বল জ্বল করছিল। বহুকাল সযত্নে রক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট দেহটি হরিত ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উশখুশ করছিল। পলিত ভাবল নিকটস্থ কোনো বিবরে আশ্রয় নেবে। কিন্তু চন্দ্রক নামে নকুল গর্তের মুখ আগলে বসে

আছে। পলিত বিপন্ন বোধ করল। মরণ তার শিয়রে। হরিতের হাত থেকে রক্ষা পেলেও চন্দ্রকের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি নেই।

পলিত ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। মহাসংকটে পড়েও তার বুদ্ধিনাশ হলো না। লোমশের খুব কাছে বসে সে উদ্ধার পাওয়ার উপায় চিন্তা করতে লাগল। সে এখন কালান্তক প্রবল শত্রু দ্বারা পরবেষ্টিত। এগোনো কিংবা পিছনোর রাস্তা বন্ধ। অনেক ভেবে স্থির করল রজ্জুবদ্ধ লোমশ প্রবল শত্রু হলেও নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। নিজের মুক্তির জন্য পলিতের কোনো ক্ষতি করবে না। উভয়ে উভয়কে অবলম্বন করে বিপদ মুক্ত হতে পারে।

পলিত বলল, ভাই লোমশ আমাদের সম্পর্ক খাদ্য খাদকের। তবুও সংকটকালে আস্থা ও বিশ্বস্ততা আমাদের বাঁচার রক্ষাকবচ হতে পারে। তাই বলছি, তুমি হিংসা পরিত্যাগ করে আমাকে তোমার উদরের নীচে আশ্রয় দাও। তাহলে চন্দ্রক ও হরিত হতাশ হয়ে প্রস্থান করবে। পরম শত্রুকে মিত্র ভেবে আস্থা স্থাপন করা খুবই বিপজ্জনক। তবু সংকটকালে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। লোমশ মুক্তির জন্য পলিতের প্রস্তাবে রাজি হল। এবং তার ভাবনামতো চন্দ্রক ও হরিত হতাশ হয়ে ফিরে গেল। পলিতও বিশ্বাসের পরিচয় দেওয়ার জন্য ফাঁদের দু-একটা বন্ধন কাটল। কিন্তু তাকে পাশমুক্ত করল না। এদিকে রাত শেষ হয়ে যখন দিনের আলো ফুটছিল তখন লোমশ বিপদাশঙ্কায় ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল। লোমশ তাকে ভর্ৎসনা করলেও পলিত কিন্তু খুব সতর্ক। ব্যাধের আগমন মুহূর্তে তার সব বন্ধনগুলি কেটে দিয়ে পাশমুক্ত করল। এবং ব্যাধের ভয়ে সে দ্রুত গাছে গিয়ে উঠল।

সুভদ্রা হেসে বলল, চমৎকার গল্প। এ গল্প থেকে কী শিখলে?

রাজনীতিতে কোনো শত্রু মিত্র নেই। সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রবল শত্রুকে কাজে লাগিয়ে প্রবল শত্রুর কাছ থেকে যদি প্রার্থিত জয় আদায় করা যায়, তাহলে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে তা করা ভালো। জয় অর্জনের জন্য কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা থাকা ভালো নয়। জয় জয়ই। যে কোনো মূল্যে জয় আদায় করা কোনো অন্যায় নয়।

এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি এই গল্পে পলিতের বিচক্ষণতা কার মধ্যে আছে? লোমশের মতো বিপন্ন, অসহায় কারা?

অভিমন্যু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, পলিতের ক্ষুরধারবুদ্ধি, এবং কৌশল একমাত্র মাতুল কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

একশর মধ্যে একশ তোমাকে দেওয়া যায়। লোমশ বলবে কাকে?

কুরুবংশের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে লোমশের স্বভাব ও প্রকৃতির মিল আছে।

সুভদ্রা বলল, ব্যাধ পরিখ?

প্রপিতামহী যোজনগন্ধা সত্যবতীর পিতা দাসরাজ। তার শর্তের ফাঁদে পড়ে কৌরব-পাণ্ডবদের এই দুর্গতি।

চমৎকার। পুত্রের বিদ্যাবত্তায় খুশি হয়ে সুভদ্রা বলল, নকুল চন্দ্রক, ও পেঁচক হরিত কে কে?

চন্দ্রক যদি কর্ণ হয়, হরিত হবে দুর্যোধন মাতুল শকুনি।

সুভদ্রা অভিভূত। বালক অবস্থায় পুত্রের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় সুভদ্রার যথেষ্ট আত্মতৃপ্ত হওয়ার কারণ ছিল। পুত্র যে তার মাতুল এবং পিতার মতো হয়েছে একথাটা মনে করতে ভীষণ গর্ব হলো। তার ছ'বছর বয়সে কে শত্রু আর কে মিত্র সেটাও চিনতে শিখেছিল। শুধু তাই নয়, পিতৃকুলের শত্রু কে, সে খুব সোজাসুজিভাবে এবং বীরোচিতভাবেই নির্ণয় করতে পারল। আনন্দে গৌরবে সুভদ্রার বুক ভাসিয়ে এল করুণ, স্নেহ, মায়া, এক ধরনের ভালোবাসা।

অভিমন্যুকে দ্বারকায় মামা-মামীর কাছে রেখে সুভদ্রা কিছুদিনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এল। সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্চর্য দুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎই একদিন হস্তিনাপুর থেকে মহামাত্য বিদুর এলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়। বিনা ভূমিকায় বলল, হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন পণ রেখে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাশা খেলতে চায়। পাশা খেলার আমন্ত্রণ পেয়ে যুধিষ্ঠির উৎফুল্ল হলো। দু'চোখের লোভ ও আনন্দের মিশ্র অভিব্যক্তি তাকে কেমন রহস্যময় করে তুলল। সানন্দে দুর্যোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। বিদুরের শত সতর্কতা কর্ণপাত করল না যুধিষ্ঠির। মনের অলিতে-গলিতে তখন কুশলী অক্ষক্রীড়ক অন্য এক মতলব আঁটছিল।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির গোটা আর্যাবর্তের অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখল। শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বে যে রাজনৈতিক জোট ভারত রাজনীতির নয়া মেরুকরণ করল তার নেতৃত্বের পুরোভাগে থাকল যুধিষ্ঠির। কিন্তু যুধিষ্ঠির বিরোধী রাজশক্তি ইন্দ্রপ্রস্থের ওপর উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধির জন্য খাণ্ডববনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকার বঞ্চিত, শোষিত, পতিত মানবকুলকে রাজনৈতিক অশান্তির ইন্ধন জোগাল। ইন্দ্রপ্রস্থের নগরের সমৃদ্ধি, উন্নতি তাদের কাছে না পৌঁছনোর জন্য যুধিষ্ঠিরই দায়ী। ফলে রাজধানীর সঙ্গে তাদের একটা ঠাণ্ডা লড়াই লেগে রইল।

রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের জন্য যে সামরিক শক্তি ইন্দ্রপ্রস্থের থাকা দরকার তা ছিল না বলেই যুধিষ্ঠির সর্বদা আক্রান্তের ভয়ে দিন গুনছিল। যত দিন যেতে লাগল ততই এই ভয়টা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা অধিকার করে বসল। এই সংকট সময়ে কৃষ্ণের অনুপস্থিতি এবং দীর্ঘকাল ধরে সৌভরাজ শাল্বের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ এক লড়াইতে কৃষ্ণ সিন্ধুদেশে দীর্ঘকালের জন্য আটকে থাকায় পাণ্ডবেরা খুব বিপন্নবোধ করছিল। অচিরে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগছিল যুধিষ্ঠির। ঠিক এরকম এক মুহূর্তে দুর্যোধনের অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাব তাকে আশান্বিত করল। তার বিশ্বাস জন্মাল, একজন দক্ষ অক্ষক্রীড়ক পণ রেখে গোটা আর্যাবর্তের অধীশ্বর হতে পারে। সেজন্য তাকে কোনো যুদ্ধ করতে হবে না। কোনোরকম রক্তপাত এবং প্রাণহানিও হবে না। শুধু মাথা ঠান্ডা রেখে পাশার দানটা দিলেই হলো। তাই পণ রেখে দুর্যোধনের সঙ্গে পাশা খেলার আমন্ত্রণ সে সানন্দে গ্রহণ করল।

কক্ষে ফিরে অর্জুন সুভদ্রাকে ক্ষত্তা বিদুরের আগমন সংবাদ দিয়ে বলল, অগ্রজের হাবভাব আমার ভালো বোধ হলো না। জুয়া খেলে কারো ভালো হয় না। তবু ক্ষত্তার নিষেধ সত্ত্বেও অগ্রজ দুর্যোধনের প্রস্তাবে রাজি হল।

তুমি তো কিছু বলতে পারতে। উদ্বিগ্ন গলায় সুভদ্রা বলল।

অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলল, কোনোদিন তার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিনি। প্রশ্নও করিনি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এটা কোনো উত্তর নয়। বিভ্রান্তি দূর করা পরম আত্মীয়ের কাজ।

আমি সৈনিক। নেতার আদেশ মান্য করাই আমার কর্তব্য। নেতা কখনও ভুল করেন না। অনেক কিছু তিনি একসঙ্গে দেখেন। সে দেখা ভুল হলেও আমি সংশোধন করতে পারি না, যতক্ষণ না তিনি নিজে আমার মতামত চাইছেন। তবে, আমার মনে হচ্ছে, অগ্রজের সামনে বেশ কিছু সমস্যা আছে। সে সব সমস্যায় তিনি বেশ কিছুটা ভাবিত। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করছেন। দ্যূতক্রীড়া করে হয়তো সে সংকট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব বলে ভাবেন।

এ পাপ খেলায় কারো কোনো মঙ্গল হয় শুনিনি। বরং সংকট ঘোরালো হয় আরো। পণ রেখে খেলা খুবই মারাত্মক। এই সর্বনাশা খেলা থেকে অগ্রজকে নিবৃত্ত করো।

উনি সংকল্পে কঠিন। একবার যা স্থির করেন, ভুল হলেও তা করবেন। পণ রেখে খেলার ভালো দিকও আছে। ওঁর মতো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে আমি সেটাই প্রত্যাশা করব।

তুমি কী প্রত্যাশা করো?

অগ্রজ একজন দক্ষ অক্ষক্রীড়ক। সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর সঙ্গে খেলতে সক্ষম হলেন শকুনি এবং বিরাটরাজ। পণে জিতলে নিজের মনোমত যে কোনো বিষয়ে তা পরিবর্তন করার পূর্বশর্ত রাখলে ইন্দ্রপ্রস্থের বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রতিকার করা সহজ হবে তাঁর পক্ষে। আমার বিশ্বাস অগ্রজ সেই কথা স্মরণ করে পুলকিত হয়েছেন। ক্ষত্তা বিদুরের সাবধান বাণী এবং নিষেধ অগ্রাহ্য করেছেন। দুর্যোধনের এই আমন্ত্রণ হয়তো তাঁর ভাগ্যের রূপরেখা বদলে দিতে পারে।

কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে। খেলার হারজিৎ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। খারাপটার কথা ভেবেই সতর্ক থাকতে হয়। যে জয় নিজের করায়ত্ত নয়, তার প্রতি অগ্রজের এত আস্থার কারণ বুঝলাম না। আমার মতে পাণ্ডবদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্তা বিদুরের কথা মান্য করলে অগ্রজের ভালো হত। তোমার কাছে খবরটা শোনা থেকে বাঁ চোখের পাতাটা সমানে লাফাচ্ছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে।

অর্জুন বলল, এই মুহূর্তে অগ্রজকে যে নিবৃত্ত করতে পারত সে হলো পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ। কিন্তু সে এখন দ্বারকায় নেই। সিন্ধুরাজ শম্বের সঙ্গে এক ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত। সেখান থেকে এখনই কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই সর্বনাশা খেলাকে অগ্রজের নিয়তি নির্দিষ্ট কর্মফল মনে করে নিশ্চিন্ত থাকাই ভালো। নিবৃত্ত যখন করতে পারব না তখন অপ্রিয় হয়ে লাভ কী?

ঘটনার গতি তখন দুরন্ত। সব কিছু বড় দ্রুত ঘটে গেল। পরিবারের সকলকে নিয়ে দুর্যোধনের আমন্ত্রণে হস্তিনাপুরে গেল, ইন্দ্রপ্রস্থের অনুকরণে নবনির্মিত নয়নাভিরাম প্রাসাদ শান্তিগৃহেই দ্যূতক্রীড়ার আসর বসল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সামনেই দ্যূতক্রীড়া করার জন্য কৌরব ও পাণ্ডবদের পক্ষে যথাক্রমে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করল ধৃতরাষ্ট্র। অক্ষক্রীড়ার প্রথম দানেই শকুনির কাছে হারল যুধিষ্ঠির। পণ রেখে পাশা খেলতে বসে যুধিষ্ঠির একের পর এক হারতে লাগল। এমন কি জেতার লোভেই প্রিয়তম ভ্রাতাদের এবং পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীকেও পণ রেখে হারল। কিন্তু তাতেও যুধিষ্ঠিরের শুভবুদ্ধির উদয় হলো না। ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় দাসত্ব ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেল। সেইসঙ্গে হৃত রাজ্যের ওপরও তাদের অধিকার পুনরায় ফিরে পেল। যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যই পুনরায় তাকে পাশা খেলতে বাধ্য করল। এক দানেই হারাল ইন্দ্রপ্রস্থ, সেই সঙ্গে বারো বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে পঞ্চপাণ্ডবকে।

পাণ্ডবদের বনবাসের সঙ্গী হল শুধু দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডবের অন্য বধূরা যে যার পিতৃগৃহে নাবালক পুত্রদের সঙ্গে বাস করা স্থির হলো। কিন্তু সুভদ্রাই আগ বাড়িয়ে বলল, তা হবে কেন? এভাবে একটা পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার মানে হয় না। আমরা একসঙ্গে ছিলাম এক সঙ্গেই থাকব। আলাদা হয়ে থাকা মানে মনটাও আলাদা হয়ে যাওয়া। পরবর্তী জীবনে ছোট ছোট সুখ, স্বার্থ, আনন্দ নিয়ে আমরা এক এক দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কোন্দল করব। পাণ্ডবদের ঐক্য সংহতির সুনাম তাতে কলংকিত হবে। পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ থাকলে এমন চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিত না। তার প্রিয়তম ভগিনী হয়ে পরম স্বজনদের নিয়ে আমার পিত্রালয় দ্বারকায় থাকব। সেখানে একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করব। তাছাড়া দ্বারকাতেই আমাদের নিরাপত্তা বেশি।

যুধিষ্ঠির বলল, কৃষ্ণভগিনীর মতো কথা বলেছ তুমি। তাহলে সকলকে নিয়ে সকলের সঙ্গে দ্বারকাতেই বাস করো। তাতে যাদব, বৃষ্ণি-অন্ধকদের সঙ্গে প্রতিদিনের দেখা শোনার মধ্য দিয়ে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে উঠবে। অন্য পাণ্ডব ভ্রাতৃবধূদের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, সুভদ্রার শ্বশুরবাড়ির লোক বলে সবাই যথেষ্ট সমাদরও পাবে। পাণ্ডব সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষারও সুব্যবস্থা হবে। বনবাসকালে আমরাও পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। তোমরা কে কেমন থাকলে, তাই নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা থাকবে না। সুভদ্রার সঙ্গে তোমরা সবাই দ্বারকায় গিয়ে থাকো।

তেরো বছর পরের ঘটনা। বিরাট দেশ থেকে দূত এল দ্বারকায়। দূতের মুখে পাণ্ডবদের নিরাপদ এবং বীরত্বপূর্ণ আত্মপ্রকাশ সুভদ্রাকে উৎফুল্ল করল। বহুদিনের উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার অবসান হল। কিন্তু তার স্পর্শকাতর মনটি তাকে সবচেয়ে কষ্ট দেয়। তার সে হৃদয় বেদনার কথা অন্য কাউকে বলতে পারে না। মনের গহনে একা একা তার ভার বহন করে। যখন খুব কষ্ট হয় তখন কৃষ্ণকেই তার মনে পড়ে। কিন্তু নর-নারীর এক জটিল সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার সময় কিছুতে সহজ হতে পারে না। লজ্জায় সংকোচে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও মন প্রস্তুত রাখার জন্য কৃষ্ণই তাকে একান্তে বলেছিল, অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি হলো পাণ্ডবদের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা, তাদের চেনে না এমন মানুষ ভারতবর্ষে নেই। পরিচয় গোপন করে আত্মগোপন করে থাকা তাদের এক কঠিন ব্যাপার। আগুনের যেমন কোনো

মুখোশ হয় না, তেমনি কোনো ছদ্মবেশে অর্জুনের আড়াল হয় না। তার নীলাভ কালো গায়ের রঙ, পেটা চেহারা, ঢলঢলে মুখ, হরিণ নয়ন, তার কণ্ঠ থেকে নির্গত মেঘ ও দুন্দুভির মতো যে গম্ভীর আওয়াজ বেরোয় কি দিয়ে তাকে লুকোবে? তাই অজ্ঞাতবাসকালে পাছে অর্জুনের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায় তাই স্বর্গ থেকে শল্যচিকিৎসা করে পুরুষ থেকে নারী হলো সে। যুবতী রমণীর সব লক্ষণ তার শরীরে ফুটে বেরোল। এমনকি তার ত্বক, নয়নের কটাক্ষ, ভ্রূ-ভঙ্গিমা কণ্ঠস্বর সবই নারীর মতন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা অদ্ভুত শঙ্কায় সুভদ্রা চমকাল। উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা ফুটল তার কণ্ঠস্বরে। বলল, কী বলছ তুমি! এভাবে নিজের সর্বনাশ করার আগে আমার কথা, অভিমন্যুর কথা একবারও ভাবল না। বনবাস থেকে যখন ফিরবে, কোন লজ্জায় ওর সামনে দাঁড়াব! কী বলে ডাকব দাদা? তার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কী দাঁড়াবে? তাকে স্বামী বলে ভাবব কী করে? লোকই বা তাকে কী বলবে? আত্মীয়স্বজনদের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করবে না? অভিমন্যু তার বাবার মধ্যে যখন একজন স্ত্রীলোককে দেখবে তখন তার বালক মনের অবস্থা কী হবে ভাবো তো? বৃহন্নলার মধ্যে তার স্বপ্নের গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে যখন খুঁজে পাবে না, কিংবা পেলেও সে একজন নারী—তখন কী কৈফিয়ত দেব তাকে? বলতে বলতে সুভদ্রার কণ্ঠস্বর ধরে গেল।

কৃষ্ণ ভগিনীর অশান্ত অস্থিরতাকে ভীষণভাবে অনুভব করছিল। অর্জুনকে তারও অত্যন্ত নির্লজ্জ মনে হল। অভিমন্যুর কথাটা অন্তত তার ভাবা উচিত ছিল। পুরুষ থেকে নারী হওয়া মানেই এক ধরনের বন্দীত্ব। একটু বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমার উদ্বেগের কারণটা আমি বুঝি। তবু মনে হয় কোথাও একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় অর্জুনের ক্লীবত্ব তার দেহে ও মনে। এক ধরনের যোগের প্রভাবে সে পুরুষ প্রকৃতিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। স্ত্রীর স্বভাব, আচরণ ও প্রকৃতির এমন নকল সে করল যে আসল-নকল একাকার হয়ে গেল। রমণীরাও তাকে নপুংসক বলে ভুল করল। কিন্তু বিরাট রাজার ভুল হয়নি। তাই নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত ধাত্রীদের দিয়ে অর্জুনের নপুংসত্ব পরীক্ষা করে তবে তাকে উত্তরার নৃত্য-গীতের আচার্য পদে নিযুক্ত করলেন।

সুভদ্রা শুনল, কিন্তু মানল না। বলল, যা হোক করে একটা বুঝিয়ে দিলেই হবে না। তা যদি হতো তা হলে অতীতে দ্বাদশবৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের অঙ্গীকার করেও সে সত্যরক্ষা করেনি। প্রবৃত্তিবেগের বশে একটার পর একটা রমণী উপভোগ

করেছিল। এবারের ছদ্মবেশটা অনেক কঠিন ছিল তাই দেহে মনে শুচিশুদ্ধ থাকতে শল্যচিকিৎসা দ্বারা পুরুষ থেকে নারী হয়েছে। তুমিও জানো, শল্য-চিকিৎসা ব্যতীত একজন পুরুষ কিংবা নারীর দৈহিক রূপান্তর হয় না। শিখণ্ডী তার দৃষ্টান্ত। সে ছিল দ্রুপদ রাজার কন্যা। যেহেতু তার মধ্যে পুরুষপ্রবণতা বেশি তাই দ্রুপদরাজ শিখণ্ডীর বিয়ে দিলেন দশানরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে। কিছুদিন পরে দশানরাজের কন্যা পিতার কাছে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী পুরুষ নয়, তার মতোই একজন নারী। স্বামী ভাবে তাকে দেখবে কী করে? এই খবর পেয়ে দশানরাজ দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে বলে হুমকি দিলেন। লজ্জায় অপমানে শিখণ্ডী রাজকন্যা এবং রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসী হল। সেখানে স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ তার গৃহত্যাগের কারণ শুনে দয়াপরবশ হয়ে শল্যচিকিৎসা দ্বারা তাকে পুরুষ করে দিল। শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে এল। এরকম কোনো ঘটনা অর্জুনের জীবনে ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস।

কৃষ্ণ ভগিনীকে প্রবোধ দেওয়ার কথা খুঁজে পেল না। ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখে সুভদ্রা কম্পিত বুকে অকপটে বলল, অর্জুনের নারী হওয়ার জন্য কার ওপর আমার সন্দেহ, নাম না করলেও অনুমান করতে পারছ তুমি। আমিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার ওপর তার যত রাগ। তাই, চিরদিন নিজের কাছে রাখার জন্য অর্জুনকে নারী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আমার সুখ তার সহ্য হয় না। প্রতিশোধ নেওয়ার এমন সুযোগ হাত ছাড়া করবে কেন? যে স্থূর্ণাকর্ণ যক্ষের কাছে শিখণ্ডী নারী থেকে পুরুষ হয়েছিল, তার দ্বারাই অর্জুনকে পুরুষ থেকে নারী হতে উৎসাহিত করেছে বলে আমার মন বলছে।

কৃষ্ণ দেখল সুভদ্রার চোখটা অল্প বোজা। কিছুক্ষণ ধরে সে যেন তার ভিতরকার দুর্জয় প্রতিরোধের ভাঙনটাকে কষ্টের সঙ্গে যুঝছিল। মনে হল, দ্রৌপদীর প্রতি তার যত অভিযোগ জমা হয়েছিল তার সব বিষটুকু উগরে দিল। এই একটা সন্দেহেই মন ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে সে যে যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল, ঘন ঘন মাথা নাড়া আর দীর্ঘশ্বাস পড়তে দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

কৃষ্ণ ওর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমার সখী কৃষ্ণার বুকে যে আগুনই থাকুক তাতে ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে সে নিঃশেষ হবে, তবু অন্যের আত্মদহনের কারণ হবে না। এই বিশ্বাস তার ওপর আমার আছে। অর্জুনের নারী হওয়ার পিছনে কেউ যদি থাকে সে উর্বশী। পরে জেনেছি যোগবলে মনকে নিষ্ক্রিয় করলে নপুংসক হয়ে ওঠা যায়। সুরলোকে উর্বশীর কাছে নৃত্য শিক্ষা করতে গিয়ে

তার এক আশ্চর্য উপলব্ধি হয়েছিল অর্জুনের। মনটা না চাইলে কিছুই করা হয় না। ইচ্ছেটা মরে গেলে মনটা ক্লীবে পরিণত হয়। সেই ইচ্ছেটাকে হত্যা করে একই দেহে সে অর্জুনও আবার নপুংসক বৃহন্নলাও বটে। আমার ধারণা তাকে নিয়ে উদ্বেগের মতো কিছু হয়নি। অজ্ঞাতবাসের শেষে অভিমন্যু তার পিতা গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়কে বৃহন্নলার মধ্যে আবিষ্কার করবে। নিজেকে বৃহন্নলা সাজিয়ে অর্জুন সকলকে বোকা বানিয়ে নিজের সঙ্গে কৌতুক করল।

দুচোখে আশার দীপ জ্বালিয়ে সুভদ্রা কৃষ্ণের চোখের ওপর চোখ রাখল। বলল, এমন কৌতুকের মাথামুণ্ডু বুঝি না। নিজের বিশ্বাসে মনটাকে সুস্থ রাখাই মুশকিল। তাই আমার ভিতরটা ভীষণ অধীর। নির্বিকার ঔদাসীন্যের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখি। আমার অনুসন্ধিৎসু সে চোখে স্বামী সম্পর্কে কতরকমের ভয়, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, লজ্জা যে আছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

সুভদ্রা নিজের বিমর্ষ ভাবনায় এতই ডুবে ছিল যে, কৃষ্ণ কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল জানে না। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে দেখল, কৃষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আর সে বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে ঘামতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে কৃষ্ণ বলল, বিরাট রাজ্য থেকে দূত এসেছে তোমাকে এবং আমাদের সকলকে নিয়ে যেতে। আমার ভাগনের বিয়ে। বিরাট রাজার একমাত্র কন্যা উত্তরার সঙ্গে ভীষণ জাঁকজমক করে বিয়ে হচ্ছে।

কথা খুঁজে পেল না সুভদ্রা। যে আবেগ উৎকণ্ঠা তার অর্জুন নামের সীমানায় এতক্ষণ আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ তার বাঁধ ভেঙে গেল। বুকের ভেতর নদীর পাড় ভাঙার শব্দ। গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারে এক অনাস্বাদিত আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল তার মুখাবয়বে। উৎফুল্ল হয়ে বলল, সত্যি বলছ! আমার অভিমন্যুর বিয়ে হবে বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সঙ্গে! কী আনন্দ যে হচ্ছে তা বলার নয়। কিন্তু বৃহন্নলার কাছে যে মেয়ে এক-বছর ধরে নাচ-গান শিখল সে তো জানে বৃহন্নলা একজন নপুংসক। তার আবার পুত্র হয় কী করে? তার অঙ্ক মেলাবে কী দিয়ে? এর পরে আচার্য সম্পর্কে তার শ্রদ্ধার হাল কী হবে ভাবতে পারো? লজ্জায় অভিমন্যু স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। বৃহন্নলাই-বা উত্তরার কাছে অর্জুনরূপে গ্রহণযোগ্য হবে কী করে? আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণের দু'চোখে কৌতুক অধরে মধুর হাসি। বলল, একটা সোজা-সরল ঘটনাকে মিথ্যে জটিল করে দেখছ।

সুভদ্রার পাল্টা প্রশ্ন, জট পাকানো ঘটনার জট খুলতেই তো যত গণ্ডগোল। আমার মাথায় কিছুতে আসছে না, শুধু অর্জুনকে ক্লীব করে দেখানো হলো কেন? অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের সংসাজার দরকার হলো না, কেবল অর্জুনকেই একজন নপুংসকের ছদ্মবেশ নিয়ে অন্তঃপুরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হলো কেন? অর্জুনের মতো বীরও এতবড় অসম্মান নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

কৃষ্ণ হসে বলল, সব রহস্য তো ওখানেই। বৃহন্নলারূপী অর্জুন যে নপুংসক নয়, বিরাটরাজ তাকে দেখেই চিনেছিল। তবু লোক দেখানোর একটা পরীক্ষা করে বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সুরক্ষা করতে তাকে অন্তঃপুরে কন্যার নৃত্যগীত শেখানোর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। কারণ বিরাট রাজার অভিজ্ঞ চোখ দুটি নপুংসক সাজে সজ্জিতা অর্জুনের মধ্যে ললনাপ্রিয় অর্জুনকে খুঁজে পেলেন না। বরং তার মধ্যে এক নতুন অর্জুনকে দেখলেন। দেহে মনে সে ক্লীব। তার পুরুষসুলভ সুঠাম পেশীবহুল পেটা চেহারা কোনো নারীর হয় না, কিন্তু নপুংসকের ভূমিকায় তাকে দিব্যি মানায় বলেই তাদের মতোই সাজসজ্জা করে অর্জুন নিজেকে নপুংসক বৃহন্নলা বলে পরিচয় দিল।

সুভদ্রার বিস্ময়ের শেষ নেই। অর্জুন অবলীলায় নপুংসক সেজে পুরুষত্বহীনতার অভিনয়ে কেমন করে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো তার চিন্তায় সুভদ্রাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। অর্জুন স্বামী হলেও তার অতিরিক্ত মহিলাপ্রীতি সে মেনে নেয়নি। এ নিয়ে স্বামীকে বহু ভর্ৎসনাও করেছে। হঠাৎই সে কথাগুলি তার বুক আলোড়িত করল। নিজের কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। এ জীবনে অনেক নারীসঙ্গ করেছ তুমি। তোমার ঘরে সুন্দরী বউ আছে। সুন্দর সুন্দর বীর্যবান ছেলে আছে। তাদের পেয়ে সুখী নও কেন? আমার তো মনে হয়, এদের মধ্যে জীবনের গভীর আনন্দ খোঁজার কোনো চেষ্টা করনি। করলে, অন্য নারী খুঁজতে না। সন্তানের মধ্যে কী বা কতখানি সুখ লুকোনো আছে ফিরেও দেখলে না, তোমার অভাবটা কোথায় আমার জানা নেই। বরাবরের মতো আমাকে পেতে লোভ হলো বলে তোমার সুখের কাছে, আনন্দের কাছে ধরা দিলাম। তবু যখন অন্য স্ত্রীকে খোঁজ তখন নিজের কাজে মস্ত হার বলে যে কত দুঃখ পাই তা কোনাদিন জানতেও চাওনি। দ্রৌপদীর সঙ্গে মিশতে, তার সঙ্গে থাকতে আমি তো কোনো আপত্তি করিনি, বাধাও দিইনি। এমনকি আটকাইনি। যা খুশি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে করো। আমার কিংবা তার বুকের মধ্যে শুয়ে থাকো। যা খুশি করো। কিংবা যখন যেখানে ডেকে পাঠাবে, সব কাজ ফেলে দৌড়ে যাব। শুধু তুমি অন্য নারীর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। তোমার লোভের আগুনে তাদের পুড়তে দিও না। এটুকু

পেলেই সুভদ্রা খুশি। আমি যে তোমাকে ভীষণভাবে ভালোবাসি। এর মধ্যে অন্য নারীকে এনে আমাকে আড়াল কোরো না। আমাকে অপমান কোরো না। মনের মধ্যে মেয়ে জাতটা সম্বন্ধে একটু শ্রদ্ধা করতে শেখো। মনের চোখ দিয়ে তাদের দুঃখ কষ্টটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো। তাহলেই হবে।

কৃষ্ণ দেখল সুভদ্রার দুচোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো পাতলা ঠোঁট দুটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। গভীর এক মানসিক সংকটে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে খাটের ওপর। কৃষ্ণ ওর স্তব্ধতার গভীরে চোখ দুটি ডুবুরির মতো ডুবিয়ে দিয়ে বলল, সময় বড় সাংঘাতিক। সময়ের সরণী বেয়ে কত কী অগোচরে ঘটে যায় মানুষ নিজেও জানে না। মানুষের পরিবর্তন হলো একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বোধ। ফুলের গন্ধের মতোই ভালো মানুষের মনের গন্ধও আপনিই চারিয়ে যায় অন্য মানুষের মনে।

বিষণ্ণ গলায় সুভদ্রা বলল, তোমার হেঁয়ালি শোনার মন নেই। যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো। অর্ধেক পেটে আর অর্ধেক মুখে রেখে কথা বলা লোকদের আমার একটুও ভালো লাগে না। সে তুমি হলেও নয়। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, সব ব্যাপারে বন্ধুকে আড়াল করতে চাও তুমি। ভগিনীর স্বার্থও বড় নয় তোমার কাছে। অথচ, ভাইরা ভগ্নীর কথাই বেশি করে ভাবে। তুমিই কেবল, সকলের থেকে আলাদা।

ভগিনীর অভিযোগ শুনে কৃষ্ণ হাসল। বলল, আমার পরান-সখা অর্জুনের কথা বলছি। সে এক বহমান নদী। মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে মুগ্ধ চমকে চলকে চলকে চলেছে। অনেক বাঁক, অনেক রোদ ঝলমল ছায়া নিবিড় এলাকা পেরিয়ে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে, পাখির ডাক শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছে। কত বৈচিত্র্যে ভরা তার জীবন। তাই বুঝতে, জানতে তাকে একটু সময় লাগে।

ধমকে কৃষ্ণকে থামিয়ে দিয়ে সুভদ্রা বলল, তুমি থামবে? তোমার বন্ধুর গুণের অন্ত নেই। লোক-ঠকানোর বিদ্যেও তার আছে। ভাবতে অবাক লাগছে, বিরাট রাজার অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে রোজ ওঠা-বসা করেও পুরুষ বলে তাকে একজনও শনাক্ত করল না। সন্দেহও হল না। এই রহস্যটা যে ঠিক কোথায় আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে কি বুঝব, নিজে সে যা নয়, অন্যের কাছে তাকে প্রতিভাত করার এক মহা কৌতুক করছে নিজের সঙ্গে। এটা তার ভারি অন্যায়।

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল। বলল, ন্যায়-অন্যায়ের কতটুকু বোঝো তুমি? একজন মানুষকে যেরকম দেখছ, তার অন্যরকম হওয়া সত্যিই কি খুব কঠিন। তোমার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ের পরে নানা ঘটনা পরম্পরায় সে মানুষটা বদলে

গেছে অনেক। অথচ, বাইরে থেকে তার বদলটা দেখা যায়নি। কিছু কিছু কথা ও ঘটনা থাকে যা মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেয়। এমন কিছু অনুভবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল অর্জুনকে। তারই ফলস্বরূপ এক ধরনের নির্লিপ্ততা, নিরাসক্তি, নির্বিকারত্ব এবং নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের রন্ধ্রপথ ধরে ক্লীবত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে। বিরাট রাজার গোধন হরণের ঘটনা তার ক্লীবত্বের অবসান ঘটিয়ে, ফের তাকে চাঙ্গা করে তুলল। তার মধ্যে পৌরুষ জেগে উঠল। নপুংসক বৃহন্নলার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক নতুন অর্জুন।

অন্য এক চিন্তায় সুভদ্রা এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, কৃষ্ণের কোনো কথাই তার কানে পৌঁছল না। সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। অর্জুনের শারিরীক পরিবর্তন না হলে অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা তাকে নপুংসক বলবে কেন? একবছর পরে আবার তার পুরুষ হওয়াটা বানানো গল্প। উর্বশীর অভিশাপ সেও গল্প। আসলে, স্ত্রী থাকতেও তাদের সঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া জনিত ক্ষোভ ও হতাশা তাকে নপুংসক হতে প্ররোচিত করেছিল। ইন্দ্রলোক থেকে নপুংসক হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। পৌরুষের লজ্জা ঢাকতে উর্বশীর অভিশাপে অভিশপ্ত হওয়ার গল্প রটিয়ে দিল।

বিরাট রাজ্যে এই বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করছিল। বৃহন্নলাকে দেখার তার কোনো আগ্রহ নেই। চিরচেনা মহাবীর অর্জুনের জায়গায় তার কোনো স্থান নেই। অর্জুনের মধ্যে যে বৃহন্নলা ছিল তার কি সত্যি মৃত্যু হয়েছে? অথবা মন থেকে যদি তাকে নির্বাসিত করে থাকে তাহলে তার ভূত পুনরায় ঘাড়ে চাপবে না তো? অর্জুনের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য, তার নির্লিপ্ত নিরাসক্তি, তার ক্লীবত্ব প্রেমের মধ্যবর্তী হয়ে তাদের সুখ শান্তি হরণ করবে না তো? এসব অদ্ভুত ভাবনায় তার মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। একটা দুরন্ত অভিমান রাগ তাকে অশান্ত করে তুলল। নিজের কাছেই তার প্রশ্ন, অর্জুনের সঙ সাজার কী দরকার ছিল? অন্য পাণ্ডবদের মতো সেও পুরুষ সেজে উত্তরার নৃত্য-গীত শিক্ষার প্রার্থী হতে তো তার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তা না করে একটা উদ্ভট সাজে সেজে এল। ছদ্মবেশ যদি করতেই হয় তাহলে নপুংসক হল কেন? ললনাপ্রিয় অর্জুন তো একজন সাধারণ রমণীর বেশেই তা করতে পারত। অর্জুন তো জানে নপুংসকের জন্য কারো বুকে কোনো প্রেম নেই। সমাজে সংসারে তার ঠাঁই নেই, সমাদর নেই। অবহেলিত পতিত মানুষের মতো দীন হীন হয়ে বাস করে। মানুষের পরিচয়ে নয়, এক আজব প্রাণীর মতোই তারা কৌতূহলের পাত্র। তবু অর্জুন এরকম একজন নগণ্য শ্রেণীর মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে নিজের অজেয় পৌরুষকে অমর্যাদা করল

কেন? তার মতো মহাবীর এভাবে নিজেকে ছোট করার মধ্যে কোথাও একটা সুতীব্র কষ্ট ও অভিমান ছিল তার। সে অভিমান কি তার ওপর, না দ্রৌপদীর ওপর? না দুজনের ওপর।

সুভদ্রাকে নিরুত্তর দেখে কৃষ্ণ বুঝতে পারছিল ওর ভেতর একটা বিরাট ভাঙাগড়া চলছে। নাভি থেকে খুব জোরে একটা শ্বাস নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হলো বুকের সব শূন্যতা হাহাকার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। কৃষ্ণ চমকে তাকাল তার দিকে। বলল, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা দিয়ে বুকের ভিতরটা খুঁচিয়ে দগদগে করে ফেলেছ। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো। মিথ্যে মন খারাপ করে, মনটাকে আর্ত করে কোনো লাভ হয় না। নিজেকে শুধু কষ্ট দেওয়া। আমি বলছি দুর্ভাবনার কিছু নেই। খোলা মন নিয়ে বিরাট রাজ্যে যাও। অর্জুন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে। দ্বিধা করে কী লাভ? সবই অদৃষ্টের খেলা। তুমি আমি না চাইলেও অভিমন্যু-উত্তরার বিয়ে হবে। কোনো কিছুই আমাদের হাতে নেই। আমাদের ইচ্ছাতেও কিছু হয় না।

সুভদ্রা বলল, আমার কষ্টটা অন্য জায়গায়। অভিমন্যু উত্তরার বিয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, সব তাইতে তোর একটু বাড়াবাড়ি। সবটাই গল্প। যদি সত্যি হয়, তাহলেই বা কী করবে? অদৃষ্ট যেখানে যেরকম বন্ধন সৃষ্টি করেছে তা হবেই। এই বন্ধনটা পাণ্ডবদের জীবনে আশীর্বাদ। বলতে পারো, তাদের একটা বৃহৎ রাজনৈতিক প্রাপ্যও। নির্বান্ধব পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে একটি শক্তিশালী রাজ্যের মদত খুবই জরুরি ছিল। বিরাট রাজ্য তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে। অভিমন্যু হলো পাণ্ডবদের জয়ের মশাল আর উত্তরা হলো ধ্রুবতারা। উত্তর আকাশে দাঁড়িয়ে দিকহারা মানুষকে চিরদিন পথ দেখিয়ে আসছে। এরা দু'জনে মিলে পাণ্ডবদের নতুন দিনের নতুন ভাগ্যরচনা করবে। মঙ্গলশঙ্খধ্বনি করে তুমি তার সূচনা করবে।

সুভদ্রা অবাক হয়ে কৃষ্ণের চোখে চোখ রেখে বলল, আশ্চর্য! আমার মনের কথাটা তুমি জানলে কী করে? কৌরব পাণ্ডবদের সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছে তাতে যুদ্ধ লাগল বলে। এরকম একটা উত্তপ্ত সময়ে অভিমন্যুর বিয়েটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। যুদ্ধের পর কে কোথায় থাকবে, কার ভাগ্যে কী আছে এসব ভেবে মনটা অস্থির। মা আর স্ত্রীর মনে সকলের আগে অশুভ চিন্তা জাগে। পাছে আমার উদ্বেগে কোনো অকল্যাণ হয় তাই মুখে কুলুপ এঁটেছিলাম। অদৃষ্টে আমার যে কী আছে কে জানে? তবে এটা বুঝেছি, উত্তরা ও অভিমন্যুর বিয়েটা তুমিও চাও।

নয়

উৎসবের আয়োজনে উপপ্লব্য নগর আনন্দে মুখর। বিয়ের মন্ত্র পাঠ থেকে কনে সাজানো সব হলো পাণ্ডবদের নিয়ম মেনে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু রাজা এবং রাজপ্রতিনিধি এলেন। যুধিষ্ঠির সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করল। মুক্তির বার্তা নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়ল আকাশে।

পাণ্ডববধূদের মধ্যে বসে সুভদ্রা নির্বিকারভাবে দ্রৌপদীকে জিগ্যেস করল, পায়রা উড়িয়ে কী হবে তুমি জানো?

বদ্ধ জীবকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। তার মুক্তি আকাশে আকাশে। ওরাই পাণ্ডবদের প্রতিভূ হয়ে জানিয়ে দিল এক নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প নিয়ে পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করছে। দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সাদামাঠা এবং নিরুত্তাপ।

বিষণ্ণ হাসল সুভদ্রা। শঙ্কা ও উদ্বেগের তীব্র আবেগকে কিছুটা সংযত করে দ্রৌপদীর কানে ফিস ফিস করে বলল, কি জানি, আমার চোখে ওরা হল আসন্ন কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধে নিহত হাজার হাজার যোদ্ধার আত্মা। ইহধাম থেকে অমৃতধামের দিকে যাত্রা করছে। মুক্তি পেয়ে ওরা শুদ্ধাত্মা হয়েছে বলেই ওরা শুভ্রবর্ণ।

দ্রৌপদীর মনের ভেতর তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠল। কিন্তু জবাব দেবার মতো কথা খুঁজে পেল না।

একটা বর্ণাঢ্য মিছিল করে এল পুরোহিত। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে বস্ত্র। পিছন পিছন এল রাজার প্রহরীরা। টকটক লাল রেশমের ঝলমলে পোশাক তাদের গায়। দেহরক্ষীদের কোমরে ঝুলছে দীর্ঘ তরোয়াল। ওদের অনুসরণ করে আসছিল পুরনারীরা। প্রত্যেকের মাথায় রুপোর বড় বড় থালা—তাল তাল হীরে জহরৎ আর সোনায় ভর্তি। আরো রয়েছে সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র এবং নানা উপঢৌকন। সবই বরপক্ষের সম্মানের জন্য নিবেদিত।

শ্বেতপাথরের তৈরি সুরম্য প্রাসাদের ভিতর বিশাল দালানে দ্রৌপদীর কাছাকাছি বসে ছিল সুভদ্রা এবং উত্তরা জননী সুদেষ্ণা। কন্যা সম্প্রদানের পর্ব কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছিল। বিরাট রাজ জামাতা অভিমন্যু এবং কন্যা উত্তরাকে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্যই সবার মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। অমনি সুগন্ধী ফুলের বলয়ে সাজানো নৃত্যস্থলীতে মরালীর মতো উড়ে এল এক ঝাঁক যৌবনবতী রাজনর্তকী। অমনি প্রবল হয়ে উঠল বীণার ঝঙ্কার। হঠাৎ কোথা থেকে তাদের মধ্যে নিরাবরণ দেহে অর্জুন এসে দাঁড়াল। পেশীবহুল

পুরুষের সুঠাম দেহ সৌষ্ঠব অবারিত করে দেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে অর্জুন এক উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠল। কী অপূর্ব সেই নৃত্য! তার স্পন্দিত দুই বাহু যেন জলের ঢেউ। তুফান হলে জল যেমন আলোড়িত ও আন্দোলিত হয় অর্জুনের দু বাহু তেমনি এক অস্থির উন্মাদনায় চঞ্চল। নৃত্যের সঙ্গে বাজনাও উতরোল হলো। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল সুভদ্রার। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছিল অর্জুনের নৃত্য।

হঠাৎ বাজপাখির মতো ছোঁ দিয়ে সুভদ্রাকে অর্জুন তুলে নিয়ে গেল নৃত্যস্থলীতে। তাকে পাশে নিয়ে নাচছিল পাগলের মতো। স্পন্দিত বাহুদ্বয় তরঙ্গায়িত হতে হতে মিশে যাচ্ছিল সুভদ্রার শরীরে। সুভদ্রার দুটি বাহু উর্ধ্বে তুলে অর্জুন চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে তার সঙ্গে নাচছিল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে গিয়ে সুভদ্রা নাচ ভুলে নৃত্যস্থলীতে বসে পড়ল। মুহূর্তে একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। তীব্র একটা আবেশে অর্জুনের দিকে চেয়ে রইল। হাতের রক্তপদ্মটি পূজারীর মতো বিনম্র ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে অর্জুনের চরণপদ্মে নিবেদন করে স্তব্ধ হয়ে রইল। কী সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোয়া সে মুখ। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল, আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও। তোমার সম্পর্কে মিছেই আজে বাজে ভেবে মনটাকে আর্ত করেছি। তাতে শুধু নিজেকেই ছোট করেছি। সে কথা মনে করাও পাপ। বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। চোখের জলে অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি।

অর্জুনের চোখ দুটো আগ্রহে প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। বুকের মধ্যে সুভদ্রাকে টেনে নিয়ে বলল, আমি তোমার মধ্যে মহৎ আর জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করি। সে সত্তা শুদ্ধ এবং মুক্ত। তার আত্মার মধ্যে ঈশ্বর থাকে। আমার মনের সমস্ত তারগুলি তারই সুরে বাঁধা।

দীপশিখার মতো কেঁপে ওঠল সুভদ্রা। চেতনার ভেতর একটা মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাল তাকে।

ভালোয় ভালোয় অভিমন্যুর বিয়ে হয়ে গেল। তবু সুভদ্রার বিমর্ষভাবটা গেল না। যাবে কী করে? পাশের ঘরে যখন অভিমন্যু ও উত্তরা বাসর যাপন করছিল তখন মন্ত্রণাগৃহে রুদ্ধ দ্বারকক্ষে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব,

রাজা দ্রুপদ, কৃষ্ণ এবং বিরাট রাজার এক উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছিল। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে কারো মন ভালো থাকে না। সুভদ্রারও ছিল না। সদ্যবিবাহিত অভিমন্যুর জন্য মায়ের উদ্বিগ্ন মনটা ভিতরে ভিতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় টাটাচ্ছিল। কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী কেউ না বললেও সুভদ্রা তার মন দিয়ে অনুভব করতে পারছিল। পারবেই বা না কেন? কৌরব পাণ্ডবদের বিবাদ তো নতুন কিছু নয়। পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরনো। ইন্দ্রপ্রস্থে বধূ হয়ে আসা থেকেই এমন অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার উত্তাপে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল তাকে। বারো বৎসর বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পরে তাদের দুঃখের প্রহর শেষ হবে ভেবেছিল কিন্তু কৌরবেরা হতে দিল না। দৃষ্টিকটু রাজনৈতিক দর কষাকষির মধ্যে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিয়েটা সুভদ্রার মনটাকে তিক্ত করে দিল। রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে তাদের দাম্পত্য প্রেমের গায়ে যে কাদা লাগল সুভদ্রা সেটা ভুলতে পারল না। ইন্দ্রপ্রস্থের ওপর অধিকারের দাবি নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে নীতির লড়াই শুরু হলো। দুই পরিবারের এই আত্মঘাতী যুদ্ধ শেষ না দেখে কারো পলায়নের উপায় নেই। কথাটা মনে হলে অভিমন্যুকে হারানোর ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠল। অন্ধকারের দিকে চাইলেই বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। সুভদ্রার মনটা সত্যি ভালো নেই। তাই জেগে বসেছিল অর্জুনের জন্য।

অর্জুন ফিরল শেষ যামে। ঘরের মধ্যে রাতের নিস্তব্ধতা থমথম করছিল। স্তিমিত আলোয় সুভদ্রার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না। তার মুখের অন্ধকার রাতের অন্ধকারে মিশেছিল। বনবাসের দীর্ঘ অদর্শনের দিনগুলিতে জমিয়ে রাখা পাথরের মতো শক্ত জমাট একটা বোধ কেমন একটা নির্লিপ্ততায় অর্জুনকে স্থবির করে রাখল। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, অনেক রাত হয়েছে, তবু শোওনি কেন?

সুভদ্রা অবাক হলো। এতবড় একটা অশান্তির পরেও মনে মনে সে অর্জুনকে খুঁজছিল, সেই চিরচেনা অর্জুন তার খুব কাছে থেকেও কতদূরে। তেরো বছর পরে তার সঙ্গে দেখা, তবু তার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই তার। ত্বকের ছোঁয়ায় স্বপ্নগুলো নড়েও না। বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে ঘরময় হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মনের অয়ন পথ বড় বিচিত্র। মন একবার নির্লিপ্ততায় সরে এলে ভাবপ্রবণতার পথে আর ফেরে না। অধরে দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটল। বলল, বোঝার মন থাকলে হয় তো বুঝতে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে কেউ ঘুমোতে পারে? আমি মা এবং স্ত্রী—এত টানটান চাপা উত্তেজনার ভার বইতে পারছি না। কিন্তু কোনো সময়ের জন্য তুমি আমার মনের কথাটা জানতে চাওনি। আমি চাই স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে। দ্রৌপদীর মতো প্রতিহিংসায়

উন্মাদ হয়ে কখনো বলতে পারব না, যুদ্ধে তোমরা অক্ষম হলে বাপের বাড়ির লোকদের নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বীরপুত্রেরা আমার সঙ্গে আছে। আমার নয়নমণি আদরের অভিমন্যু তার বড় মা'র অপমানের প্রতিশোধ নিতে আগে প্রাণ দিতে আসবে। মা হয়ে অভিমন্যুকে আমার কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য ডেকে নিচ্ছে কেন? তোমার ওপর যেহেতু তার রাগ, তাই অভিমন্যুকে দিয়ে তোমার শাস্তি দিতে চায়।

সুভদ্রার রূপান্তর দেখে অর্জুন অবাক হল। কার মনে কখন কী ঘটে যায় সে নিজেও বোধ হয় জানে না। ঈষৎ চঞ্চল দেখাল অর্জুনকে। বলল, তুমি কত বদলে গেছ ভদ্রা।

সুভদ্রা ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ বদলের আর এক নামই বেঁচে থাকা। তাই না?

অর্জুন সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, হঠাৎ এসব কথা উঠছে কেন? আমারও কি এসব কথা শুনতে ভালো লাগে? আমার পুত্রের ওপর বিমাতারও কিছু দাবি করার অধিকার আছে। অধিকারের কথা যে বলে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তার নিজের জ্ঞান আছে?

মানি, কিন্তু আপনস্বার্থে নিজের সিদ্ধান্তকে অন্যের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়নি কখনও। স্বামীর সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে কোনো সংঘাত চায়নি। পতিব্রতা স্ত্রীর মতো তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি প্রতিবাদ অন্তরে গোপন রেখে। তুমি যা করতে ভালোবাস তাতে বাধা দিইনি। তোমার সব কর্তব্যের পাশে দাঁড়িয়েছি অশান্তির ভয়ে, কর্তব্য বোধে—প্রেমে বা আদর্শের উত্তাপে নয়। কিন্তু আজ নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছে। আর পারছি না বোঝা বইতে। মায়ের প্রাণ—অভিমন্যু উত্তরার কথা ভেবে ভেবে এতই অস্থির যে উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা চেপে রেখে সুস্থ থাকাই মুশকিল। বিপুল অবসাদে দেহ মন অবসন্ন। কিছু ভালো লাগছে না।

অর্জুন বলল, আমিও খুব সুখে নেই। আমার বুকের ভেতর কি হচ্ছে, বাইরে থেকে তার আলোড়ন টের পাবে না। ভগবান পুরুষ মানুষকে বজ্র দিয়ে নির্মাণ করেছে। বুক পেতে ঝড়কে বরণ করার শক্তি দিয়েছে। পুরুষের জীবনে কত কর্মের আহ্বান, কত কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার। দুর্যোগের তিমির ঘন আকাশের ন্যায় সে মহা মৌন। ভিতরটা তার যত অশান্ত হোক, বাইরেতে সে শান্ত।

সুভদ্রার মুখে বাঁকা হাসি। ধারাল হলো। বলল, পাণ্ডব শিবিরে তুমি প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মতো শোভা পাচ্ছ। যে প্রদীপের আলোয় তুমি আলোকিত তার

পাদদেশের অন্ধকার নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয়। কিন্তু তুমি দেখেও দেখো না।

চমৎকার। তবু ভুল বললে একটু। প্রদীপের নীচের অন্ধকারে প্রদীপের নিজের ছায়াও মিশে থাকে। আমার মনেও তার যাতনা লুকোনো। আমার তামশ তোমার দুর্ভাবনার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের চেয়ে কম কালো নয়। অবাক হচ্ছ তাই না? আমিও পিতা। মায়ের মতো পিতার হৃদয়ও কাঁদে। তবে, চোখের জলে বুক ভাসানো কান্না সে নয়।

অর্জুনের গলায় এমন কিছু ছিল যে সুভদ্রা চুপ করে গেল। জানলার বাইরে আকাশ নিশ্চুপ, সুস্থির। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গিয়ে সুভদ্রা আঁধারে ঢাকা তারা ভরা আকাশের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অর্জুন স্নিগ্ধ চোখে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, রাত অনেক হলো। শোবে চলো। অন্ধকার বলে রাতকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নক্ষত্রখচিত আকাশ, গাছপালা, অরণ্য-পর্বত, মাটি-মানুষ সবাইকে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে রাতের অন্ধকার। কেউ কিছু দেখছে না, শুনছেও না। কারো কোনো প্রশ্ন নেই। কেবল ধারাবাহিক অবলুপ্তি। আবার কাল সূর্যালোকিত প্রভাতে নতুন করে সংগ্রামের কথা ভাবা যাবে। এবার আমাদেরও বিশ্রাম। এবার নিদ্রা। বলতে বলতে বড় করে একটা হাই তুলল অর্জুন।

সকাল থেকেই বাক্যালাপ বন্ধ করেছিল সুভদ্রা। কেন বাক্যালাপ বন্ধ করে গুম হয়েছিল অর্জুন তার কান্নাটা বুঝল না। তবে, তার সামনে দিয়ে যখনই যাওয়া আসা করছিল নিজের মনে গজ গজ করছিল। ঝগড়াটা অর্জুনই শুরু করুক এটাই চাইছিল সে—এ হল তার ভূমিকা। অর্জুন তার অভিপ্রায় বুঝে মুখে কুলুপ এঁটে রইল। কথায় বলে বোবার শত্রু নেই, এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রেখে অর্জুন সুভদ্রার তৈরি ফাঁদে পা দিল না। অর্জুন যত নির্বিকার, নির্লিপ্ত থাকল ভেতরে ভেতরে সুভদ্রার রাগের পারদ তত চড়তে লাগল। সুভদ্রার মতো সব মেয়েরা জানে তাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছে বিধাতা। তাদের নীরব প্রতীক্ষার ফাঁদে পুরুষেরা ধরা দেবেই। শেষ হাসিটা তারাই হাসে।

ধনুকভাঙা পণ করে অর্জুনও বেশিক্ষণ নির্লিপ্ত থাকতে পারল না। সুভদ্রা মুখ আঁধার করে তার সামনে ঘুর ঘুর করছে কিছু বলার জন্য। বুকের ভেতর সে কষ্ট

বয়ে বেড়াচ্ছে আর সে কাপুরুষের মতো তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এটা ভারি অন্যায় তার। সুভদ্রা তো একটু সহানুভূতি প্রত্যাশা করতেই পারে। মুখে কিছু না বললেও অর্জুন তো জানে, কোথায় তার ব্যথা। তার অভিযোগটা কী, কত জায়গায় কত রকমের বাধা নিয়ে তাকে সংকোচে দিন কাটাতে হয়। বুঝেও এড়িয়ে যায় সমস্যাটা। বিয়ের পরে সব মেয়ে বাপের বাড়ি একটানা দীর্ঘকাল থাকতে লজ্জা পায়। সেক্ষেত্রে পাণ্ডবদের গোটা পরিবারটা নিয়ে ভাইদের সংসারে থাকার লজ্জায় মরে আছে। এজন্য সুভদ্রার অন্তরে ক্ষোভ জমা স্বাভাবিক। এ দুর্গতি তো তাকে বিয়ে করার জন্য ভোগ করতে হচ্ছে। এই বোধটা তাকে সুভদ্রার জন্য সহানুভূতিশীল করল। বলল, আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝি। কিন্তু আমাদের সাধ্য নেই তোমার বোঝা হালকা করার। বাস্তবিকই তোমার মনের মধ্যে এখন কোন অবস্থা চলেছে—দুঃখের না উদ্বেগের, সুখের না যন্ত্রণার, না বললেও বুঝতে পারি।

বিরক্তিতে ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত হল সুভদ্রার। কপালের ভাঁজগুলো গভীর হলো। বলল, তোমার মন বলে কিছু আছে?

অর্জুন খুব হালকাভাবে কথাটা নিল। রাগে অভিমানে সুভদ্রা ফুঁসছিল। তাই একটু রসিকতা করে বলল, রক্তমাংসে মানুষের শরীরের মধ্যে মন বাস করে। সেটা বাদ দিয়ে মানুষ হয় না। মন না থাকলে সে মানুষ হয় মৃত, না হয় পাগল।

সুভদ্রার রাগ হলো খুব। বলল, চোখে চামড়া থাকলে লজ্জা পেত। সেটা নেই বলে দু'কান কাটা। যাদের আত্মসম্মান আছে তার শান্ত, মন খারাপ করা আর্তি বুকে নিয়ে অসহায়ের মতো দিন যাপন করে।

অর্জুন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, কী বলতে চাও একটু বুঝিয়ে বলবে।

ছেলের বিয়ে তো দিলে, ছেলে বউকে কোথায় তুলবে তার কথা ভেবেছ। নিজেদের মাথার ওপর ছাদ নেই, পায়ের তলায় মাটি নেই। কোথায় থাকবে তার ঠিকানা জানা নেই—দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতার মতো ছেলের বিয়ে দিয়েই কর্তব্য খালাস। কোথায় থাকবে, কী খাবে এসব একবারও ভেবেছিলে! আমাকে একবার জিগ্যেস করার প্রয়োজন বোধ করলে না। অথচ এসব ব্যবস্থা করে ছেলের বিয়ে দেয় বাবারা। তুমি এসব ভাবনার বাইরে।

আচ্ছা তুমি এতো রেগে আছ কেন বলতো? অভিমন্যুর বিয়ে দেওয়ার আমি কে? সবই আগে থাকতে স্থির হয়ে থাকে। এখানেও তাই ছিল। কেবল আমাদের জানা ছিল না। সত্যি বলতে কি, জন্ম থেকেই মামার বাড়ি রয়েছে। বিয়ের পরে বৌ নিয়ে সেখানে উঠবে। মামারাও সেটা চাইবে। ভাগ্নে, ভাগ্নে বৌ মামার বাড়ি

থাকবে,তাতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবন পূর্ণ হয় না।

চমৎকার! সত্যি! তোমার লজ্জা অপমান বলে কিছু নেই।

এখন আমরা একটা সংকটের মধ্যে চলেছি। আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা যদি বুঝতে তাহলে এসব কথা মুখে আনতে না। এই মুহূর্তে পাণ্ডবেরা হাবড়ে পড়া হাতির মতো। ব্যাঙের লাথিও মুখ বুজে সইতে হয়। নিরুপায় না হলে নির্লজ্জ চক্ষুচর্মহীন আত্মসম্মান জ্ঞানহীন কেউ হয়?

কেউ কিছু বলছে না ঠিক, কিন্তু আমার লজ্জা করে। একা নই, গোটা শ্বশুরবাড়ির লোকজন, ঝি-চাকর সব নিয়ে বাপের বাড়িতে ভাইদের আশ্রয়ে আছি। এক-আধ দিন নয়, তেরোটা বছর এভাবেই কাটল। তোমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা আমার বাপ-ভাইরা বইবে কেন? ছেলে-বৌ নিয়ে কোথায় ঘর বাঁধবে সে তোমাদের সমস্যা, তোমরা ঠিক করো। তাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন? এতে তাদের কাছে যে রোজ কত ছোট হয়ে যাচ্ছি, চেয়েও দেখছ না। দয়া করে অগ্রজকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু একটা করো।

অর্জুনের গলার দ্রবীভূত স্বর পাতিহাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল। বলল, আমিও যে এসব ভাবি না, তা নয়। ভেবে তো আর উদ্ধার পাব না; সংকটটা উত্তীর্ণ হওয়া আসল কথা। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তো মনের লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারছি না। আবার উদ্ধার চাইলেই তা পাওয়া যায় না। আমরা যেতে চাইলেও কৃষ্ণ, বলরাম এই মুহূর্তে আমাদের যেতে দেবে না। যদি উল্টোটা হতো তুমি কী করতে?

একটুক্ষণ সুভদ্রা স্তব্ধ হয়ে রইল। শাড়ির আঁচলের প্রান্তটা হাতে জড়াতে লাগল। উদাস গলায় বলল, সব বুঝি। তবু চারপাশের ছোট ছোট স্বার্থে মনটা নোংরা হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বেশ আছি। খাচ্ছি, দাচ্ছি, কাজ করছি, হাসছি, সকলে মিলে আনন্দ করছি, অন্যের সঙ্গে আনন্দ, দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছি, তবু মনে হয় এসব একঘেয়েমি অভ্যেসের মধ্যে বাস করে আমরা যাকে বাঁচা বলি সেটা আদৌ স্বাস্থ্যকর বাঁচা নয়। এই বোধটা ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয়।

সুভদ্রার দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎই কষ্টে মন ভরে যায়। তার কষ্টের ভার লাঘব করার জন্য বলল, মনটা বোধ হয় কাচ দিয়ে তৈরি। কাচ পরিচ্ছন্ন থাকলে ঝকঝকে দেখায়, হীরের দ্যুতির মতো মনটাও আলো করে রাখে।

আবার ঐ কাচটা নিজের অসাবধানতায় যদি ভাঙে, টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ভালো জোড়া দিয়েও দাগটা ঢাকা যায় না। মনটা তারের বাজনার মতো। তার ঢিলে হয়ে গেলে সুর থাকে না আর। মনগড়া কিছু কল্পনা করে নিজেকে ছোট করতে পারো সেটা তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু নিজেকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে তোমার মহান বাপের বাড়ির মানুষদের ছোট করার কোনো অধিকার তোমার নেই। সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

সুভদ্রার চোখের কোণ দুটো জ্বালা করতে লাগল। অনেক বছর কাঁদে না অর্জুনের আদর খাবে না বলে। এখন অর্জুনের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারলে সে হালকা হতো অনেক। কিন্তু সেও পালিয়ে গেছে। এখন দুঃখ হলে, খুব কান্না পেলে চোখ জ্বালা করে শুধু। তবু কান্নার বেগটা সামলাবার জন্য দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁট।

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে একটা বড় রকম যুদ্ধ হোক সুভদ্রা চায় না। জন্মসূত্রে কৌরববংশের রক্ত তার শরীরে আছে। তার মা রোহিণী হলো পৌরবী কন্যা। পুরুবংশের মেয়ে। সেদিক দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র হলেন তার মাতুল বংশের। আবার নিজেও পরিবারের বধূ। কৌরবও পাণ্ডবদের তাই কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তার পছন্দ নয়।

যুদ্ধ মানে নির্দয় নিষ্ঠুর হত্যা। আত্মীয় বিয়োগ। স্বজন হারানোর শ্মশানে বসে অশ্রুপাত করা। এই ভাবনাই তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। মনের সব শান্তি কুরে কুরে খায়। বিশেষ করে তার সবচেয়ে বেশি ভাবনা হয় অর্জুনকে নিয়ে। কৌরব পাণ্ডবদের যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী বীর অর্জুনকে তো এক বিরাট ভূমিকা নিতে হবে। পুত্র অভিমন্যুও যে পিতাকে অনুসরণ করবে সে তো বলাই বাহুল্য। তাই যুদ্ধ আতঙ্কে সুভদ্রার মনটা সবসময় মন মরা হয়ে থাকে। স্বামী-পুত্র হারানোর আকাঙ্ক্ষা তার বুকে পাথরের মতো ঝুলে আছে।

যুদ্ধের সম্ভাবনা যত প্রকট হয় ততই দুরন্ত উদ্বেগে সুভদ্রার ভেতরটা অস্থির হয়। কিন্তু দ্রৌপদীর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধটা হোক, এটা দ্রৌপদী চায়। অকপটে সেকথা বলতেও তার কোনো সংকোচ নেই। কিন্তু সুভদ্রার অন্তঃকরণ দ্রৌপদীর মতো কঠিন কঠোর নয়। সে মা, সে বধূ। প্রিয় স্বামী-সন্তান হারানোর কথা ভেবে যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয়। যুদ্ধ কিছুই দিতে পারে না। যুদ্ধ শুধু নব নব দুঃখ আর যন্ত্রণা দেয়। যুদ্ধটা তাই যাতে বন্ধ হয় সেজন্য দ্রৌপদীর

শরণাপন্ন হলো। কারণ যুদ্ধ হওয়া না হওয়ার চাবিকাঠিটা তারই হাতে। সে না চাইলে এ যুদ্ধ হয় না।

সুভদ্রার সব ভয় ভাবনা অভিমন্যুকে নিয়ে। মাত্র ছ'মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে যুদ্ধের ভূত ঘাড়ে চেপে বসেছে। কপালে কি আছে ঈশ্বরই জানে। শুধু তার কথা ভেবেই সুভদ্রার রাতের ঘুম গেছে। দু'চোখের পাতা বন্ধ করলে হাজার হাজার রক্তমাখা লাশ চোখের তারায় ভেসে ওঠে। তখন দ্রৌপদীর ওপর রাগ হয়। এসব কিছুর জন্য তাকে দায়ী মনে হয়। ঐ মহিলার কী আছে যে পুরুষ মানুষ পাগল হয়? পাণ্ডবদের সব দুর্ভাগ্য লাঞ্ছনার মূল কারণ ঐ মহিলা। এই যুদ্ধের কারণও দ্রৌপদী। প্রতিকারের প্রত্যাশায় সুভদ্রা অন্য কারো কাছে নয় তার কাছেই গেল।

খুব সন্তর্পণে পা রাখল কক্ষে। রহস্যময় আকর্ষণের এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হল। মৃদু গলায় ডাকল দিদি!

দ্রৌপদী ঘাড় ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, ও সুভদ্রা। এস বোন। হঠাৎ কী মনে করে এসেছ?

সুভদ্রা একটু হাসার চেষ্টা করল। শ্লেষের হাসি। বলল, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে মনটা একটু হালকা করতে এলাম। বলতে গেলে রণভেরীতে কাঠি পড়ে গেছে। অভিমন্যুকে নিয়ে ভাবনা হয়। তাই বলছিলাম কি, সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। এখন আমরা সবাই মিলে মহা সর্বনাশটা কি ঠেকাতে পারি না? পাণ্ডববধূদের বিশ্বাস, যুদ্ধের রাশটা তুমি নিজের হাতে টেনে ধরতে পারো। বিধাতা তোমার মধ্যে সে শক্তি দিয়েছে। তুমি আমাদের সবার অগ্রগণ্যা। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি। আমাদের মতো হতভাগিনীদের কথা একটু ভাবো।

দ্রৌপদী বেশ একটু অবাক হলো। এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে সে খুশি হলো না। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার রাগের হলকা বেরোচ্ছিল। রাগে দাঁত কিড়মিড় করল। তবু উত্তপ্ত মাথাটি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রাখল। তারপর মনটাকে শক্ত করে অদ্ভুত হাসল। মনে হলো যেন ডাইনী হাসল তার অধরে। বলল, ভাববটা কী? আমি কে? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু? কার্যত আমি কেউ নই। সারা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সে যুদ্ধ কখনও ব্যক্তিগত থাকে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমার কোনো ভূমিকা নেই। যুদ্ধের লাটাইটা আছে তোমার ভাই কৃষ্ণের হাতে। বোধহয় তাও নয়। বহু রাষ্ট্রের ও রাজার মিলিত স্বার্থের একটা মঞ্চে আমরা সবাই

সমবেত হয়েছি। এক একজনের এক এক রকম অভিসন্ধি। যার স্বার্থের সঙ্গে যে পক্ষের সম্পর্ক সে পক্ষেই যোগ দিচ্ছে সে।

একথায় সুভদ্রা একটু ঘাবড়ে গেল। সন্দেহের গলায় বলল, তাই কি? হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থের দখল নিয়ে একই বংশের লতায় পাতায় যুদ্ধ। এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের পারিবারিক স্নেহ, মমতা, প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক। শুধু একটা সংবেদনশীল মনের অভাবে উত্তরণটা হচ্ছে না। একটা জায়গায় সবাই আটকে আছে। কিন্তু তুমি অনেক কিছু গভীর করে অনুভব করতে পারো।

থমথমে মুখে দ্রৌপদী বেশ কিছুক্ষণ সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে তাকে বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর স্ফুরিত অধরে একটু রাগের ভাব প্রকাশ করে বলল, তোমার ধারণা ভুল। এযুদ্ধ কৌরব পাণ্ডবের বিরোধের মধ্যে থেমে থাকলে ভারতবর্ষের অন্য রাজারা এতে নাক গলাত না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের বদলে যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করা হল তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপে পড়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছিল। যেহেতু পাণ্ডবদের কোনো সামরিক শক্তি ছিল না, তাই যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে থাকার ফলে বৃহৎশক্তির যে মেরুকরণ রাজসূয়যজ্ঞ হয়েছিল, কার্যত তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় তার মেরুকরণ হলো নতুন করে। তাই কে কোন পক্ষে থাকবে, কার স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করবে এই যোগ বিয়োগের খেলায় আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল হয়ে উঠেছে। সেজন্যই বলছি যুদ্ধটা কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জোট রাজনীতিতে জোটের সার্থকতায় আকৃষ্ট হয়ে বিবিধ রাজ্যের রাজাদের ব্যক্তিগত ক্রোধ বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা নিয়ে এই যুদ্ধে যদি তারা অংশগ্রহণ করে তাহলে বুঝতেই পারছ এতে আমার কোনো ভূমিকাই নেই। আমার কথা শোনার মানুষ নেই। স্বামীরাও আমার বিপক্ষে। শান্তির জন্য তোমার ভাই কৃষ্ণকে তারা দূত করে কৌরবসভায় পাঠাচ্ছে। আমি চাই, কৃষ্ণের উদ্যোগ ব্যর্থ হোক। সর্বনাশা যুদ্ধের ভয়ংকর অভিশাপে ধ্বংস হোক কৌরব বংশ। আমায় যারা অপমান করেছে, তাদের লাঞ্ছনার প্রতিকার যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এ বুকের আগুন নিভবে না। তাতে গোটা পৃথিবী যদি মহাশ্মশান হয়ে যায়, যাবে।

সুভদ্রা বজ্রাহতের মতো অবাক হয়ে চেয়ে থাকল দ্রৌপদীর দিকে। চিরচেনা দ্রৌপদীর মধ্যে এ কোন রাক্ষুসীকে দেখছে? বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে। কেমন একটা অদ্ভুত কষ্ট হয়। কিছুক্ষণ বোধহয় সে মানুষ ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল।

দ্রৌপদী রাগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল। আত্মগ্লানিতে জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো অনুচ্চস্বরে বলল, আমার সব জেহাদ কৌরবদের বিরুদ্ধে। এ জীবনে তাদের কোনোভাবে ক্ষমা করতে পারব না। তাদের রাজ্য, সম্পদ, সিংহাসনের ওপর আমার কোনো লোভ নেই। তার নিষ্পত্তির জন্য আমি যুদ্ধ চাই না। আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে স্বামীদের যদি পাশে না পাই তা-হলে আমার বীরপুত্ররা জননীর লাঞ্ছনা, অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রাণপণ লড়বে। ঘরের মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে তার ভ্রাতারা এবং পিতা স্বয়ং। এ হল একজন ব্যক্তির অপমানের প্রতিশোধের লড়াই। তার আত্মসম্মানের সঙ্গে অসম্মানের সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থ ও রাজার মর্যাদা জড়িয়ে নেই। তাই বলছিলাম এ যুদ্ধ হবেই। এ থেকে পলায়নের কোনো উপায় নেই।

রাগ হল সুভদ্রার। কী যেন বলি বলি করেও সামলে নিল। দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে তার সব প্রতিবাদ বজ্রের মতো এঁটে রেখে নিজকে সামলাল। মৃদু স্বরে বলল, খালি হাতে ফিরে যাব?

দ্রৌপদীর বুকে ঝড়ো বাতাসের দোলা। তেজের সঙ্গে বলল, স্বামী পুত্র হারানোর দুঃখ, যন্ত্রণা, শোক, হাহাকার তোমার মতোই আমার বুকে বাজবে। তবু যুদ্ধক্ষেত্রে শ্মশানে চিতা জ্বলবে।

মেয়েমানুষ যে, এত নির্দয় নিষ্ঠুর হতে পারে ভাবতে পারে না সুভদ্রা। রাগে তার ফর্সা মুখখানা আগুনের মতো গনগন করছিল। রাগের ঝাঁঝে গলাটা কর্কশ শোনাল। বলল, না। তুমি রাক্ষুসী। তোমার বুকে প্রেম, মমতা, স্নেহ, প্রেম কিছু নেই। দুঃশাসনের বক্ষ রক্তের তৃষ্ণায় তোমার রসনা তৃষ্ণার্ত। তাই তোমার চোখ নেই, মন নেই। প্রতিহিংসার আগুন তোমার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দু'হাতে নিজের তপ্ত মাথাটা চেপে ধরে দ্রৌপদী ফুঁসে ওঠল। হ্যাঁ, এ পৃথিবীতে আমার স্বামী, সন্তান, সংসার, আত্মীয়, বান্ধব, ভ্রাতা কেউ নেই। আমি এক বন্ধ্যা ধরিত্রী।

সুভদ্রাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ভিতরকার সব রাগ নিয়ে কাঁপা গলায় বলল, হ্যাঁ, তাই। হাহাকার ছাড়া যুদ্ধ তোমাকে কিছু দিতে পারে না। নিজেও জানো না কী হারাচ্ছ তুমি? তোমার দু'চোখে ডাইনীর তীক্ষ্ণ হিংস্রতা। তুমি করুণারও অযোগ্য। তোমার মুখ দেখাও পাপ।

অবশেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘোষিত হলো। হিরন্ময়বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রের দিগন্তলীন প্রান্তরে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধের সৈন্য সজ্জিত হলো। মহর্ষি বেদব্যাস, জ্যোতিষার্ণব চতুর্থ পাণ্ডব নকুল গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করে বলল, পাণ্ডবেরা সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান করলে জয় সুনিশ্চিত। সেইমতো তারা প্রান্তরের পূর্বভাগের দখল নিল। চতুর্পার্শ্বে সৈন্য শিবিরের মধ্যবর্তী হয়ে বিরাজ করছিল কৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডবের শিবির।

যুদ্ধকালে অর্জুনকে ছেড়ে থাকতে চাইল না সুভদ্রা। তার সঙ্গে শিবিরে একসঙ্গে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সুভদ্রাকে ভরসা দেওয়ার জন্য বলল, তুমি অকারণ আমার জন্য বিচলিত হচ্ছ। আমি কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবধারী অর্জুন। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমিই অন্যের ভয়ের কারণ। বীরের কোনো পিছুটান থাকতে নেই।

সুভদ্রার অধরে মোহন হাসি। বলল, আমি তোমার পিছুটান। সেজন্যই তো তোমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেপ্টে থাকা দরকার। সুভদ্রা হরণের সময় আমিই হয়েছিলাম সাথী। মনে আছে সে কথা।

অর্জুনের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। বলল, সেটা ছিল একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। এটা হলো মহাযুদ্ধ। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর আলিঙ্গন।

এ শুধু মহাযুদ্ধ নয়, এক ভয়ংকর যুদ্ধ। এখানে ভ্রাতা-বন্ধু, পিতা-পুত্র, আত্মীয়স্বজন বলে কেউ নেই। এ হলো উন্মাদ হত্যার এক বধ্যভূমি। দুঃখের ভাগ নিতে তোমার পাশে আমাকে থাকতেই হবে। মহর্ষি বেদব্যাস নক্ষত্র, তিথির অবস্থান পর্যালোচনা করে নিজেই শঙ্কিত। একমাসে দুটি অমাবস্যা, কৃষ্ণপক্ষ। সূর্য ও চন্দ্রের দুটি পূর্ণ গ্রহণ ছাড়া সর্ববৃহৎ একটি বৃহৎ ধূমকেতু আকাশে উদয় হয়ে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সূচনা করবে। এক বিরাট ধ্বংসের মহাশ্মশানে বসে পৃথিবীর নারীরা বুক হাহাকার করা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আর এক প্রজন্মের অপেক্ষা করবে। মহর্ষির মতে এ ধরনের অদ্ভুত গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ আগে হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ। হলেও অন্য এক পৃথিবীতে। তারপর থেকে ভয়ে মরে আছি।

তুমি অর্জুন পত্নী। ভয় তোমার মানায় না।

যার স্বামী, সন্তান রণক্ষেত্রে, তার পৃথক ঘর বলে কিছু নেই। কপালে কি আছে জানি না। এই রণক্ষেত্র স্বজনদের সঙ্গে আমারও শেষশয্যা হোক। আমি মন স্থির করে ফেলেছি, তোমার সঙ্গে থাকব বলে।

পঞ্চপাণ্ডবের হৃদয়েশ্বরী দ্রৌপদী আছে।

তোমাদের চিরচেনা দ্রৌপদী মরে ডাইনি হয়েছে। বুকে তার রাবণের চিতা। প্রেম, মমতা, দয়া, মায়া সেই চিতায় আহুতি দিয়েছে। তোমার কষ্টকে শীতল করার কোনো জাদু তার নেই।

মৃদু ভর্ৎসনা করল অর্জুন। ছিঃ সুভদ্রা। সপত্নীগত ঈর্ষা-বিদ্বেষে নিজেকে ছোট কর না।

ছোট তো তোমরাই করেছ তাকে। আমার বুকে অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আছে। তাকে অশ্রদ্ধা করতে কোথায় দেখলে? ভালোবাসি বলেই তার হৃদয়হীনতাকে সহ্য করতে পারি না। নারীর স্বভাবচ্যুত হওয়ার জন্য তোমরা সকলে দায়ী। নিজের সম্ভ্রম, মর্যাদা নিয়ে তোমরা কেউ তাকে নিজের মতো বাঁচতে দাওনি। তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের জন্য কিনা করেছে সে। বিনিময়ে কিছুই পায়নি তোমাদের কাছে। তার জন্য কোনো ত্যাগ নেই তোমাদের। স্বামীদের ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে তাকে। প্রতিকারহীন লাঞ্ছনা, অপমানের আগুনে পুড়ে পুড়ে নারীর কোমলতা, স্বভাবের মাধুর্য ছাই হয়ে গেছে। তার এত বড় অপমৃত্যুর জন্য রাগ হয় তার ওপর। এভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিয়ে কোন ভুবন সে রচনা করবে? আমার এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে তুমি?

অর্জুন চুপ করে থাকল। ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে নিজের মনে বলল, মানুষের কতরকমের ভাবনা-দুর্ভাবনা, উদ্বেগ, অশান্তি কিন্তু বাইরের প্রকৃতি কী শান্ত, কী ভীষণ নির্বিকার এবং উদাসীন। এমন কি পাখি-প্রজাপতি, কাঠবিড়ালি কি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে, খেলা করছে, ঝগড়া করছে। তবু কারো জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, উদ্বেগ নেই। বেশ আছে। কেবল মানুষই ভালো নেই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তেরোদিন অতিক্রান্ত। চতুর্দিকে মৃত মানুষের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ। প্রতিদিন এত মানুষ নিহত হচ্ছে যে একরাতের মধ্যে তাদের সৎকার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, পচা-গলা শবের দুর্গন্ধে গোটা প্রান্তর ভরে আছে। সেই দুর্গন্ধ বাতাসে সওয়ার হয়ে পাণ্ডব শিবিরেও ঢুকে পড়েছে। বিবিধ সুগন্ধ দিয়ে

কটুগন্ধ চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। শিবিরের মধ্যে সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে থাকতে সুভদ্রা হাঁপিয়ে ওঠেছিল। একা থাকলে মাথার মধ্যে যুদ্ধের হস্তির বৃংহন, অশ্বের হ্রেষারব, রথের ঘর্ঘর শব্দ, মারমুখী সৈন্যের রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ার উল্লাস, আহত মানুষের মরণার্তনাদ তার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এসব ভাবনা থেকে কিছুতে মনটাকে মুক্ত করতে পারে না। তখন কিছু ভালো লাগে না। বুক চাপা কান্না নিয়ে শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। এক আশ্চর্য দ্বিধাভরা চোখে সুভদ্রা পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু মনটা তার চুপ করে ছিল না। কতরকমের কথা বলছিল নিজের সঙ্গে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে সে নিজেকেই খুঁজছিল। অভিমন্যুর জন্য মনটা উন্মনা হয়েছিল। পাছে, যুদ্ধে যেতে হয়, তাই অর্জুন সমানে আগলাচ্ছিল তাকে। কিন্তু যুদ্ধের এমনই হাল হলো যে, অর্জুনের অজান্তে তাকে যুদ্ধে যেতে হলো। সেটাই হলো সুভদ্রার দুশ্চিন্তার কারণ। এর মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল সুভদ্রা। একটার পর একটা ছবি তার চোখের তারায় ফুটে উঠল।

মূল যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র থেকে কৌশলে অর্জুনকে সরিয়ে নিয়ে গেল কৌরবেরা। আত্মঘাতী সংসপ্তকবাহিনীর মারমুখী আক্রমণ মোকাবিলা করতে অর্জুন কৃষ্ণের কথোপকথনের সময় সুভদ্রাও ছিল সেখানে। অর্জুনের কণ্ঠস্বরে যুগপৎ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোল। বলল, শুনতে পাচ্ছি, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য এবং পাণ্ডবদের ওপর চাপ বৃদ্ধির জন্য আচার্য দ্রোণ আত্মঘাতী সংসপ্তক বাহিনী এবং নারায়ণী সেনাদের সহায়তায় অন্য একটি নতুন যুদ্ধাঞ্চল খুলছে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাসাধ্য করছিল। কিন্তু খুব একটা সফল হচ্ছিল না। শুধুই সৈন্যক্ষয় হচ্ছিল।

সুভদ্রা ইতিমধ্যে শরবৎ হাতে করে সেখানে এসে দাঁড়াল। ভাই ও স্বামীর হাতে সরবতের গ্লাস তুলে দিয়ে বলল, পরশুরাম ধরিত্রী নিক্ষত্রিয় করেছিলেন, আর তোমরা ধরিত্রীকে মানুষশূন্য করবে।

কৃষ্ণের অধরে বিচিত্র হাসি। বলল, ভুল ভগিনী ভুল। আমরা কিছুই করি না। সবই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঠিক সময়ে সেটা প্রত্যক্ষ হয়। আমরা কেউ সেটা বুঝতে পারি না বলে নিজেকে অপরাধী ভাবি।

তারপর, অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচার্য দ্রোণ যা করলেন তাতে পাণ্ডবদের ভালো হলো। কাল, তুমি আমি মিলে সংশপ্তকের আত্মঘাতী বাহিনী এবং নারায়ণী সেনাকে যদি নির্মূল করতে পারি তা-হলে কৌরবেরা সামরিক দিক দিয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে।

সখা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভার কার ওপর অর্পণ করবে? ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম মিলে যা পারে করবে। বড় আক্রমণের দরকার নেই, কোনোরকমে প্রতিহত করে পরাজয়টাকে ঠেকালে হবে। এটুকু ওঁরা পারবেন। আচার্য দ্রোণের সমরকৌশল বদলানোর জন্য এটা সম্ভব হলো।

অর্জুনের ঘোলা ঘোলা দুই চোখে সংশয় এবং কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। বলল, কাল কী হবে জানি না। তবে, কৌরব পাণ্ডবের জয়-পরাজয় নির্ণয় করা অনেক সহজ হবে।

সুভদ্রা মুখে চোখে কেমন একটা বিপন্ন অসহায়ভাব। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, আমার ভয় করছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর একটা কিছু হবে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। প্রতিদিন কীভাবে যে কাটে আমার ভগবানই জানে। বিশ্বাস করো, তোমরা শিবিরে না ফেরা পর্যন্ত মনের মধ্যে শুধু কু গায়। চোখ ভরে জল নামে। স্বজন হারানোর দুঃখে বুক হাহাকার করে।

কৃষ্ণ, ভগিনীর খুব কাছে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত রেখে বলল, পাগলি! সংবেদনশীল মনটাকে ভেবে কষ্ট দেওয়া যায়, কিন্তু জীবনের দীপটা তাতে উজ্জ্বলতর হয় না। মন যখন খুব অশান্ত হবে, তখন মনে মনে বলবি, আনন্দম, পরমানন্দম, পরম সুখম্ পরমাতৃপ্তি। দেখবি, মন শান্ত হয়ে গেছে। চন্দনের সুবাসে বুক ভরে গেছে।

কৃষ্ণের কথায় সুভদ্রার বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করল। জগতকে দেখার এক তৃতীয় নয়ন খুলে গেল তার। আকাশভরা রোদের আলোর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা সুদূরলোক থেকে ভেসে আসা এক ঋষির কণ্ঠে শুনল, মানুষ অন্য কাউকে কিছু দিতে পারে না, নিজেকেই দেয়। পতির প্রতি প্রেম, পুত্রের প্রতি স্নেহ, কন্যার প্রতি মমতা সব নিজের সুখ, তৃপ্তি, আনন্দের জন্য। নিজের আত্মাকে পরিপূর্ণ করার জন্য। খুব আশ্চর্য লাগল। এ অনুভূতির স্বাদ মনের অভ্যন্তরে কোথায় লুকোনো ছিল? এ তার কষ্টের সান্ত্বনা, না অমৃতের স্বাদ। এর নামই কি অমরত্বের স্বাদ।

ঠিক এরকম একটা মুহূর্তে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অসময়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে রণক্ষেত্র ছেড়ে শিবিরে ফিরতে দেখে খুবই অবাক হল। তাদের মুখে চোখে মর্মান্তিক অপমানের চিত্তদাহী জ্বালা। ভয়ংকর কোনো দুঃসংবাদের পূর্বাভাস মনে করে একটা অদ্ভুত আবেগে তার ভিতরটা কম্পমান হলো। অর্জুনের কিছু হয়েছে ভেবে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চোখের জলে তাকে দিশেহারা দেখাচ্ছিল। তার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির ভ্যাবাচাকা হেয়ে গেল। বলল, ভদ্রা, তুমি কাঁদছ? পঞ্চ

পাণ্ডবের কিছু হয়নি। সবাই প্রাণে বেঁচে আছে। কেবল আমরা ভালো নেই। আচার্য দ্রোণের নতুন রণকৌশলের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমাদের নেই। তাঁর তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে যুদ্ধ কৌশল দরকার তা আমরা কেউ জানি না। এ এক নতুন চক্রব্যূহ রচনা করে তিনি আক্রমণ শানাচ্ছেন। তাঁকে এখনি প্রতিহত করতে না পারলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমাদের মধ্যে অর্জুন এবং অভিমন্যুই জানে চক্রব্যূহ ভেদ করতে। তুমি তাকে যাত্রার অনুমতি দাও। তাকে সামনে রেখে আমরাও ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করব।

সুভদ্রার পাশেই ছিল অভিমন্যু। পিতৃব্যদের কথায় তার বীর রক্ত নেচে উঠল। সুভদ্রার পাংশুমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, তুমি ভয় পেও না। আচার্য দ্রোণের এই চক্রব্যূহ একটি গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেকটি চক্রের মুখে এক এক অস্ত্রবীর থাকে, অন্তরাল থেকে তারা আক্রমণ করে মূল চক্রে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। এই চক্রব্যূহের ঐ ভুলভুলাইয়ার রহস্যটা যার জানা তার কাছে মূল চক্রের মধ্যিখানে পৌঁছানোটা একটা খেলা মাত্র। পাণ্ডবদের জয়ের ভাবনা মাথায় রেখে আমি ঠিক পৌঁছে যাব।

দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ



যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বলল, আমরাও তোমার পিছন পিছন সেই পথে ঢুকে পড়ব।

ভীম তাকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, তুমি যুদ্ধে অর্জুনের সমান। একবার ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে আমাদের জয়ের পথ খুলে যাবে।

অভিমন্যু সুভদ্রার অনুমতির জন্য বলল, মাগো, বয়সে ছোট হলে কী হবে, যে কোনো মহারথীর সঙ্গে মহড়া নিতে সক্ষম। তুমি দেখো, মত্ত মাতঙ্গের মতো ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে সব তছনছ করে দেব। পিতা পিতৃব্য ও মাতুলের প্রীতির জন্য এবং মায়ের গর্বের জন্য এই যুদ্ধটা আমাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তোমার বীরপুত্র অভিমন্যু হারতে জানে না। পিতা ধনঞ্জয়ের গৌরব হানি হয় এমন কাজ কদাপি আমার দ্বারা হবে না। মাগো তুমি পিতৃব্যদের হতাশ এবং নিরাশ করলে সেটাই হবে আমার কাছে সবচেয়ে বড় পরাজয়।

সুভদ্রা দু'চোখ বুজে তার ভিতরের সব উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠাকে অবরুদ্ধ করে কথাগুলো গিলেগিলে বলল, তোমার মাতুল বলেন, সব কিছুই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। হয়তো এভাবে যাওয়াটা তোমার পূর্ব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আমি চাইলেও, আমার বা তোমার ভবিতব্যকে বাধা দিতে পারব না। পুত্র, সবার অভিলাষ পূর্ণ করতে জয়ী হও। ঈশ্বর তোমার কর্মের সহায় হউন। বলতে বলতে সুভদ্রার কণ্ঠস্বর বুজে এল। সুভদ্রা নিজের হাতে পুত্রকে সাজিয়ে দিল। অভিমন্যুর প্রিয় রঙ সবুজ। ঝলমলে সবুজ পোশাকে সাজাল বীরপুত্রকে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে বীরপুত্রকে কর্ণিকা বৃক্ষের ধ্বজ চিহ্নিত রথে তুলে দিল সুভদ্রা। তার দ্রুতগামী রথের পিছন পিছন চলল যুধিষ্ঠির ভীম ও সাত্যকি।

দিনের আলো ফিকে হয়ে আসছিল। শিবিরের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। অপসৃয়মান ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল। কত কী মনে হচ্ছিল। অভিমন্যুর কথা মনে হলে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। মায়ের মন তো, সকলের আগে খারাপটাই ভাবে। অভিমন্যুর কিছু হয়েছে মনে হলে শরীর মন চমকে ওঠে। ওর যদি কিছু হয়, তাহলে সে বাঁচবে কী করে? উত্তরাই-বা বাকি জীবনটা কী নিয়ে কাটাবে? এসব ভাবনায় মনটা ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ হল। চেষ্টা করেই প্রশ্নটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না বলেই একটা কষ্ট বুকের খাঁচায় ভারী পাথরের মতো ঝুলে রইল।

অস্তরাগের রঙ লেগেছে আকাশের গায়। গোটা আকাশখানা লাল রঙে রাঙা হয়ে আছে। আকাশও কেমন ম্রিয়মান। নীড়ে ফেরা পাখিরা লাল আলো ডানায় মেখে কুলায় ফিরল। কুয়াশার মতো অন্ধকার নামছিল খুব ধীরে। আস্তে আস্তে বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছিল জলে স্থলে অন্তরীক্ষ্যে। দূরে শিয়াল ডাকছিল। যুদ্ধের কোলাহলও থেমে গেছে। তবু অভিমন্যু শিবিরে ফিরল না। চঞ্চল হল সুভদ্রার মন। তা-হলে কি অভিমন্যু ফেরেনি? তাহলে কি, ব্যূহ ভেঙে অভিমন্যুর সঙ্গে যুধিষ্ঠির, ভীম, সাত্যকি চক্রব্যূহে ঢুকতে পারেনি? সহায়তার জন্য অভিমন্যুর পাশে

কেউ ছিল না? নিঃসঙ্গ বীর বালককে একা যুদ্ধ করতে হলো শার্দূলদের সঙ্গে। অমঙ্গল আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। ভীষণ ভয় করতে লাগল তার। কল্পনেত্রে হঠাৎ অভিমন্যুর ছিন্নবাহু, কবন্ধ রক্তমাখা দেহ দেখল। আঁৎকে উঠল ভয়ে। পাছে পুনরায় সে দৃশ্য দেখে তাই চোখ বুজল। মা হয়ে একী সর্বনাশ করল? আপন পুত্রকে শর্দূলদের মুখে তুলে দিল? সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অর্জুন শিবিরে ফিরলে কি জবাব দেবে তাকে? কাকে দোষী করবে? উত্তরা যখন জানতে চাইবে তার বীর কেন ফিরল না, কী কৈফিয়ত দেবে তাকে? নিজের প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল সুভদ্রা।

শিবিরে আলো জ্বলেনি কোথাও। হঠাৎই মশালের আলোয় উদ্ভাসিত হলো শিবির প্রাঙ্গণ। অগণিত সৈন্য নতমস্তকে একটা শবাধার বহন করছিল। আর তাদের পুরোভাগে ছিল যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, সাত্যকী এবং সর্বোপরি দ্রৌপদী। সুভদ্রার শিবিরে সামনে শবাধারটি এসে থামল। নিজেকেই প্রশ্ন করল কার শব ও। কার এমন সর্বনাশ হল? হঠাৎই একটা হতচকিত বিহ্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করল। সারা শরীরটা এত ভার বোধ হল যে তার চলৎশক্তি রইল না। মশালের আলোয় দেখল অভিমন্যুর মুখ। চোখ দুটি খোলা। অধরে স্মিত হাসি। জ্যোতিহীন দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। এক নিঃশব্দ অভিযোগ ছিল যেন তার পিতৃব্যদের ওপর।

সুভদ্রার সর্বাঙ্গে আচমকা একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। তৎক্ষণাৎ শিবিরের সমস্ত স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে এক ভয়ার্ত ভয়ঙ্কর আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে। চোখে জলের ধারা নামল। সব ঝাপ্সা দেখছিল। তবু দু'চোখ জোর করে মেলে ধরে পুত্রকে দেখার চেষ্টা করছিল।

কাঁদতে কাঁদতে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। চোখের জল শুকিয়ে গেল। সমস্ত চেতনার ওপর তার নেমে এসেছিল বিহ্বলতা। কেমন একটা উদভ্রান্ত আর শূন্য দৃষ্টিতে মূর্ছিতা উত্তরার দিকে তাকিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে উত্তরার মূর্ছিত দেহের ওপর আছড়ে পড়ে শরাহত বিহঙ্গীর মতো মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা গো, আমরা বড় অভাগা। জীবনের প্রথম বড় যুদ্ধে আমার বীর পুত্র হেরে গেল নিজের কাছে নয়, মানুষের নীতিহীন বিবেকহীনতার কাছে।

দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এভাবে ভেঙে পড়লে হবে? উত্তরা রয়েছে, তার পেটে অভিমন্যুর সন্তান। তার কথা ভাবো। শৌর্য, বীর্য দিয়ে মরণজয়ী যুদ্ধ করে আমার অভিমন্যু বীরের খ্যাতি অর্জন করেছে।

তার মৃত্যু নেই। অভিমন্যুর এই মৃত্যুটা যতকাল মানুষের মনে থাকবে ততদিন আচার্য দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ইতিহাসের কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। আর আমাদের সাধের অভিমন্যু চাঁদের মতো আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওদের মধ্যে বিরাজ করবে। চাঁদের কলঙ্ক চাঁদের গৌরবকে কমায় না, বাড়িয়ে তোলে। তেমনি ওদের অগৌরবের কালিমা আমাদের অভিমন্যুর বীর খ্যাতি ও গৌরব স্পর্শ করবে না।

সুভদ্রার মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। আচমকা উদাস চোখে দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে রইল। গভীর শোকের মধ্যে সুভদ্রা অনুভব করল একজন জননী প্রবল গর্ববোধের মধ্যে তীব্রভাবে বেঁচে থাকার মানেটাকে কী দারুণ আবিষ্কার করেছে। তার সব দুঃখ, কষ্ট, বেদনা জল হয়ে গেল চোখের জলের নোনা সাগরে। নিজের জন্য না হলেও উত্তরার জন্য অভিমন্যুর ভাবী সন্তানের জন্য সুভদ্রাকে বেঁচে থাকতে হবে। নইলে, অভিমন্যুর আত্মা শান্তি পাবে না। তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।